KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : 28, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ১৬
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দ আচার্য্য মজুমদার
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7"x9.5" 17.78x 24.13 c.m.
Vol. & Number : 9/- 9/- 9/- 9/- 9/-	Year of Publication : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬ আষাঢ়, ১৩৬৬ শ্রাবণ, ১৩৬৬ ভাদ্র, ১৩৬৬ আশ্বিন, ১৩৬৬
	Condition : Brittle : Good
Editor : আনন্দ আচার্য্য মজুমদার	Remarks :

CD Roll No. : KLMLGK

Regd. No. C3597 Phone: 23-5155 July '59 (0.50) SAMAKALIN

এনামেলের বাসন

- দামে সস্তা
- ভারে লঘু
- ব্যবহারে টেঁকসই
- বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যকর

সেরামিক সেলস্ করপোরেশন লিঃ

২৪ চিত্তরঞ্জন এভিন্যু, কলিকাতা-১২

সম্পাদক। আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

সপ্তম বর্ষ । শ্রাবণ ১৩৬৬

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

এই ভদ্রলোক পশ্চিম বঙ্গের দুর্গাপুরে নবনির্মিত কোক-ওভেন প্ল্যাণ্ট-এ কাজ করেন। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে যে তিনটি ইস্পাত কারখানা তৈরী হচ্ছে তার কাজ শেষ হয়ে গেলে ভারত ইস্পাত, কোক কয়লা ও কয়লা থেকে তৈরী সমস্ত জিনিসে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে।

এঁর প্রিয় সিগারেট

উইলস্-এর

সিজার্স

১০টির দাম ৩০ নয়া পয়সা

দি ইণ্ডিয়ান টোব্যাকো কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত

ICI/296

সমকালীন

শ্রাবণ ॥ সপ্তম বর্ষ ॥ ১৩৬৬

॥ সূচীপত্র ॥

ভারতীয় নাম ও তাহার সমস্যা ॥ বিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত ২১৫

শিশিরকুমার ॥ রাখাল ভট্টাচার্য ২২২

উত্তরবঙ্গের লোকগীতি ॥ ভবানীগোপাল সান্যাল ২২৮

নাট্যশালার অবিস্মরণীয় পুরুষ ॥ গোপাল ভৌমিক ২৩৫

সান্নিধ্য ॥ চিন্তামণি কর ২৪০

একছিল কন্যা ॥ স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৬

ছেলে চাই ॥ বীরেন্দ্র মিত্র ২৫০

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ॥ রবি মিত্র ২৫৩

সমালোচনা—নরেন্দ্রকুমার মিত্র। নারায়ণ চৌধুরী ২৫৭

॥ সম্পাদক ঃ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

EARLY WORKS

মূল্য ১৩·০০,

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে রক্ষিত 'অভিসারিকা' 'বুদ্ধ ও সুজাতা' 'ওমর খৈয়ম' 'ঋতুসংহার' প্রভৃতি চিত্রের রঙিন প্রতিলিপি। শ্রীনন্দলাল বসু, শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী স্টেলা ক্রামরিশ ও সুবিখ্যাত শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় লিখিত আলোচনা সহ।

ভারতশিল্পে মূর্তি

মূল্য ০·৫০

"ভারতীয় শিল্পে মূর্তিগঠনের মূল তত্ত্ব ও সৌন্দর্য বুঝিবার পক্ষে অল্প পরিসরেও ইহা যথেষ্ট সহায়ক হইবে।"

—যুগান্তর

ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ

মূল্য ০·৫০

"শিল্পীর প্রকাশ-বেদনা বা উদয়-বাসনা ছন্দে সংবদ্ধ হইয়া রসের সাহায্যে কিরূপে আত্মা হইতে চিত্রে এবং চিত্র হইতে আত্মান্তরে সঞ্চারিত হয়, অনুপম ভাষায় শিল্পাচার্য তাহা ব্যাখ্যা করেছেন।"

—প্রবাসী

সহজ চিত্রশিক্ষা

মূল্য ১·০০, বোর্ড বাঁধাই ২·০০

"অবনীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনকাঠি দিয়ে শিশুর মনের ঘুমন্ত শিল্পীকে জাগিয়ে তোলার বন্দোবস্ত করেছেন।"

—চতুরঙ্গ

গল্প

মাসি

মূল্য ২·৫০

"ছবি লেখাই এ সব লেখার বর্ণনা।"

—দেশ

মাসি, বনলতা ও হাতেখড়ি গল্প তিনটি ছোটদের উপযোগী হ'লেও বড়দের কাছেও এর আদর কম নয়। এই তিনটি গল্প একত্র করে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। কুটুম-কাটুমের কর্মরত কারিগর অবনীন্দ্রনাথের একখানি আলোকচিত্র সংবলিত। বোর্ডে উৎকৃষ্ট বাঁধাই।

পথে বিপথে

মূল্য ২·৫০

"গদ্য কতটা কাব্যধর্মী হতে পারে, বাংলা ভাষার 'পথে বিপথে' নিঃসন্দেহে তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।"

—চতুরঙ্গ

আলোর ফুলকি

মূল্য২·৫০

"অবাক হয়ে গেছি এ বই পড়ে। ভাবতে পারিনি এ রকম বই বাংলা ভাষায় সম্ভব।"

—কবিতা

স্মৃতিকথা

ঘরোয়া

মূল্য ২·৫০

"ঠাকুর-পরিবারের, ও তাকে কেন্দ্র করে তদানীন্তন অভিজাত ও মধ্যবিত্ত বাংলা দেশের যে রূপ ঘরোয়ায় ফুটে উঠেছে তা ইতিহাসের পাতায় কিংবা অন্য কোনো বইএ পাওয়া যাবে না, একমাত্র রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা'য় ছাড়া।"

—চতুরঙ্গ

বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

স ম কা লী ন

স প্ত ম ব র্ষ

শ্রাবণ। ১ ৩ ৬ ৬

ভারতীয় নাম ও তাহার সমস্যা

বিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত

সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিগত নামেরও ক্রমবিবর্তন, ও পরিবর্ধন ঘটেছে। পৃথিবীর সকল দেশের ও সকল সমাজের নরনারীর নাম ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বিভিন্ন ভাষা, উপভাষা, কৃষ্টিবৈষম্য, সামাজিক রীতি বৈচিত্র্য মানুষের নামকে নানা ভাবে রূপান্তরিত, বিকৃত ও পরিবর্ধিত করেছে; একপদী নাম হইতে বহুপদী নামের সৃষ্টি হয়েছে। একই মূলগত নামের ভাষান্তরিত, উপভাষাগত, আঞ্চলিক বা বিকৃত রূপ পৃথক নাম হিসেবে বিভিন্ন জাতির, সম্প্রদায়ের ও অঞ্চল বিশেষের মধ্যে দেখা যায়। এই ভাবে অঞ্চলান্তরে, ইহুদী নাম 'আব্রাহাম' হয়ে দাঁড়িয়েছে মুসলমানী নাম 'ইব্রাহিম'; সংস্কৃত নাম "ব্রজভূষণ" পরিবর্তিত রূপ নিয়েছে 'ব্রিজভিখেন'-এ; 'হরকৃষ্ণ' হয়েছে "হরকিষেণ"। বাঙ্গালী নাম "হরদও" পাঞ্জাবে গিয়ে রূপ বদলে হয়ে দাঁড়িয়েছে 'হরদিত'। এসব ক্ষেত্রে আদিরূপ ও পরিবর্তিত রূপ দুইই ব্যবহৃত হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বা প্রদেশে পৃথক পৃথক নাম হিসেবে।

নাম গঠনের সংক্ষিপ্ত ধারা

অনেক ক্ষেত্রে নামের বুৎপত্তিগত রূপ ও অর্থ খুঁজে বের করা শক্ত। ভাষাতত্ত্ববিদগণ এবিষয়ে তৎপর; কতকগুলি ক্ষেত্রে তাঁদের আবিষ্কার কৌতুকপ্রদ। তাঁরা বলেন ইংরেজী নাম 'Horlick' এর জন্ম 'Harlock' থেকে; Harlock হচ্ছে "Hoar+Lock" এর সমাসনিষ্পন্ন (?) রূপ; সম্ভবতঃ উক্তনামধারী প্রথম ব্যক্তির Hoar lock বা সাদা কেশগুচ্ছ ছিল। বর্তমানে Horlick কেবল ব্যক্তিকে বোঝায়না, বংশপদবী বা 'সারনেম'-এ পরিণত হয়েছে। এ উদাহরণ হলো দৈহিক বিশেষত্বের উপর ভিত্তি করে নামকরণ। বৃত্তির ভিত্তিতেও নামকরণ হয়েছে পাশ্চাত্যে; যথা, Waller (rough mason or wall builder) রাজমিস্ত্রী)—এটি একটী 'সারনেম' ও বংশপদবী

হয়ে দাঁড়িয়েছে, যদিও বর্তমানের অমুক Waller উক্ত বৃত্তি অবলম্বন করেন না। এমনি ভাবে Baker, Weaver, Barker (Tanner) প্রভৃতি 'সারনেম' এর জন্ম হলো—বংশের ধারাবাহিক নাম কায়েক করবার জন্য। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও জমিদারী প্রভৃতি প্রথার উদ্ভবের পর ব্যক্তিগত নামের বিশেষ পরিচিতি হিসাবে জমিদারী ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তস্থানের নাম হয়ে দাঁড়াল 'সারনেম' হিসেবে। পাশ্চাত্যে ডিউক, ভাইকাউন্ট্, আর্ল প্রভৃতির 'সারনেম' এই ভাবেও হয়ে থাকে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন, ভারতীয় নামের 'সারনেম' বা স্থায়ী বংশপদবী নাই বলিলেই চলে। অবশ্য, ভারতীয় স্থায়ী বংশপদবী Baker, Tanner, Weaver, Nicholson প্রভৃতির ন্যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় না, তবে স্থায়ী পরিচয় পদবী নাই একথা বলিলে সম্পূর্ণ ঠিক বলা হবে না। অবশ্য, অনেক ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তিগত নামের সঙ্গে বিভিন্ন পরিচয়সূচক পদবী ব্যবহার করেন বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ধারণা এই যে ভারতীয়দের স্থায়ী পদবী বা 'সারনেম' নাই, যথা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ, ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—একই ব্যক্তির নাম। আবার, অমুক 'ভট্টাচার্য' মহাশয় অমুক "শাস্ত্রী" হিসেবে খ্যাতি লাভ করে ঐ নামেই পরিচিত হতে লাগলেন। যাহোক, অনেক ক্ষেত্রে কায়েমী ভাবে একই পরিচয় পদবী ব্যবহৃত না হোলেও বহুক্ষেত্রে 'জাতি' নাম, 'বৃত্তি' নাম, "স্থান" নাম ইত্যাদি কায়েমী ভাবে ব্যক্তিগত নামের পরিচিতি জ্ঞাপন করে। ভারতীয় ব্যক্তিগত নাম (পারসনাল বা প্রপার নেম) গঠনের ব্যাপারে দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও অধিগত বা কাল্পনিক গুণকে ভিত্তি করা হয় অনেক ক্ষেত্রে, যথা, 'শীতল' রায়; 'সুশীল', "সুন্দর" লাল; "সুশান্ত", "শোভন" কুমারী প্রভৃতি। "অষ্টাবক্র" মুনির নাম অনেকেই জানেন। কিন্তু, এভাবে নিষ্পন্ন নাম বংশপদবীতে (সারনেম) পরিণত হতে দেখা যায় না ভারতীয় নামে। তবে 'বৃত্তি' নাম অনেক ক্ষেত্রে 'সারনেম' হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যদিও বর্তমান নামধারী উক্ত বৃত্তিজীবী নন; যথা কর্ম্মকার, হালদার (হাওয়ালা দার), মেহ্‌তা (কেরাণী), পাটেল (মোড়ল), যোশী (জ্যোতিষী) প্রভৃতি অথচ এই সব 'বৃত্তি' নাম ইংরেজী 'বেকার' 'ট্যানার'-এর মত কায়েমী ভাবে বংশপদবী হয়ে দাঁড়িয়েছে—ইংরেজীতে যাকে বলে 'সারনেম'। 'জাতি' নামও বাংলা প্রভৃতি অঞ্চলে স্থায়ী বংশপদবী হয়েছে— কয়াল, কোলে, পুর-কায়েত (পুণ্ড্রক্ষত্রিয়), প্রভৃতি। দক্ষিণভারতে কিন্তু, 'জাতি' নাম ব্যক্তিগত নামের অনুপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়— কৃষ্ণস্বামী আয়াঙ্গার, রঙ্গনাথ আয়ার প্রভৃতি। স্বাধীন ভারতে অঞ্চল বিশেষে জাতিনাম বর্জনের রেওয়াজ দেখা যাচ্ছে—যথা, শ্রীমান নারায়ণ 'আগরওয়াল' নামের 'আগরওয়াল' বর্জিত হয়েছে; রাজেন্দ্রপ্রসাদ 'শ্রীবাস্তব' এই নামের 'শ্রীবাস্তব' পদবী লোপ পেয়ে দাঁড়িয়েছে 'রাজেন্দ্র প্রসাদ'।

একপদী ও বহুপদী নাম।

অন্যান্য সভ্য দেশের নামের মত ভারতীয় নামও আদিতে একপদী ছিল। ক্রমশ দুই পদবিশিষ্ট নাম এর প্রচলন হল, যেমন দেবদত্ত, বিষ্ণুপালিত প্রভৃতি। কালক্রমে এই দুই পদবিশিষ্ট সমাস-নিষ্পন্ন শব্দ পৃথক ভাবে লেখা হতে লাগল। যথা দেব দত্ত; বিষ্ণু পালিত। আরও দেখা যায় প্রথমদিকের হিন্দু নাম সংস্কৃত শব্দের দ্বারা গঠিত হত। পরে বিভিন্ন ভাষা, উপভাষা প্রভৃতির মাধ্যমে আদি নাম বিভিন্ন অঞ্চল ও ভাষা ভিত্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা বিকৃতরূপ ধারণ করল।

সমাজের গণ্ডী যখন সংকীর্ণ ছিল তখন একপদী বা দুই-উপাদান বিশিষ্ট (dithematic) নামে ব্যক্তি পরিচয়ে বিঘ্ন হতনা। লেখক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীদের ঐ নামেই পরিচয় সাধন হত। কারণ তাঁদের সংখ্যা ছিল কম এবং একই নাম বিশিষ্ট খ্যাতিমান ব্যক্তি বা বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা একাধিক ছিলনা, বা বিরল ছিল, যেমন, নাগার্জ্জুন, কালিদাস, ভবভূতি, ভর্তৃহরি প্রভৃতি।

সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নতি ও বুদ্ধির ফলে বুদ্ধিজীবী ও বিদগ্ধজনের সংখ্যা বাড়তে লাগল। ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়ে ধনিকশ্রেণীর জন্ম হল। এসব বুদ্ধিজীবী, বিদগ্ধ ও ধনী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেদের ব্যক্তিনামের সঙ্গে পরিচিতসূচক শব্দ, বিশেষণ বা খেতাবের প্রয়োজন হল। এই সব পরিচিতিসূচক শব্দের মধ্যে পিতার নাম, জন্মস্থানের নাম, বৃত্তি নাম, জমিদারীর নাম, খেতাব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সর্বদেশ ও সর্বজাতির মধ্যে এই পরিচয়সূচক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় নাম গঠনে। যথা, **এ্যাংলোস্যাক্সন নাম :** Aelfred Ae thelwulfing (এথেল উলফের পুত্র আলফ্রেড্); **মুসলমান নাম :** আবু হোসেন (হোসেনের পিতা); ইব্‌ন-বা'-তুতা (বা' তুতার পুত্র); **পার্শী নাম :** দীনশ' রুস্তমজী (রুস্তমজীর পুত্র দীনশ্); **মারাঠী নাম :** বাল গঙ্গাধর (গঙ্গাধরের পুত্র 'বাল' বা বালক); **গুজরাতী নাম :** মোহনদাস করমচাঁদ (করমচাঁদের পুত্র মোহনদাস) প্রভৃতি। খোঁড়া তাই মুরের নাম ছিল তাই মুরলং(Tamerlane বা 'Lame Timur') আরবী ও পার্শী নামে বহুপদ দেখা যায়।

এভাবে বহুপদী নামের সৃষ্টি হল ব্যক্তিনামের পরিচয়ের সুবিধার জন্য। ফলে দেখা যায়, সমস্যা দাঁড়িয়েছে কোনটী আসল নাম ও কোনটী পরিচিত শব্দ; পিতা পুত্রের নাম একসঙ্গে যুক্ত থাকলে মুস্কিল বাধে যদি অঞ্চলবিশেষে ব্যবহৃত নামের পদগুলির ব্যবহারের ক্রম (Succession বা order) না জানা থাকে।

আরও সমস্যা দেখা যায় নামের উপাদানগুলি কয়েক ক্ষেত্রে একটী ভাষা থেকে নেওয়া হয়না অনেক ভাষার সাহায্যে নাম গঠনের উদাহরণ বিরল নয়। যথা **জবাহির** লাল, **বাহাদুর** সিং, **গলাব** সিং, **হুকুম** চাঁদ, **ফতে** সিং এসব হিন্দু নামে আরবী ও পার্শী শব্দ আছে।

বংশপদবী (বা 'সারনেম')

ভারতীয় নামের ইতিহাসে দেখা যায় যে দুই পদবিশিষ্ট সমাননিষ্পন্ন ব্যক্তিগত নাম ক্রমশঃ সমাস হইতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পদ দুইটী আলাদা ভাবে লেখা হওয়ার দরুণ দ্বিতীয় পদটী (পদান্ত) কায়েমী বংশপদবী রূপে পরিণত হয়েছে। মনে করুন, একই বংশের তিন ভাই এর নাম 'হর দত্ত', 'গুরুদত্ত', 'সোমদত্ত', তাদের ছেলেদের নামকরণের সময়ও "কৃষ্ণদত্ত", "বিষ্ণুদত্ত" প্রভৃতি নাম দেওয়া হল। এই ভাবে উক্ত বংশ "দত্ত" বংশ রূপে খ্যাত হল এবং "দত্ত" পদবী ছড়িয়ে পড়ল বংশের ধারায় শাখা প্রশাখায়। এমনি ভাবে 'বিষ্ণুপালিত', 'বসুমিত্র' প্রভৃতি নাম হইতে 'পালিত' ও 'মিত্র' পদবীর ('সারনেম') সৃষ্টি হয়েছে। এ মত অনেকে পোষণ করেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে দেখা যায় এই সব 'পদান্ত' বাঙ্গালীদের বংশপদবীতে পরিণত হয়েছে। এরূপ পদান্তের আরও উদাহরণ দেওয়া যায়— যথা, কীর্তি, লাহা, গুপ্ত, গুহ, পাল, কর, পাইন। এসব পদান্ত কিন্তু সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ নয়। পাইন ('পাণির অপভ্রংশ); 'লাহা' (নাথ হইতে) **দেব দেবীর নাম** অবলম্বনেও বংশপদবীর উদাহরণ পাওয়া যায়; যথা,

আইচ্ ('আদিত্য' শব্দের অপভ্রংশ); ইন্দ্র, রুদ্র, সোম, হোম (কাহারও কাহারও মতে ইহা সোম শব্দের পারিভাষিক শব্দ ঃ পূর্ববঙ্গে 'স' কে 'হ' বলা হয়); শোর, হোর, শূর (সূর্য্য)। **প্রাণীর নাম** হইতেও বংশ পদবীর উদাহরণ বিরল নয়, যথা, নাগ (সর্প), সিংহ, শী (সিংহের তদ্ভব শব্দ), হাতী, হাইত (হাতীর অপভ্রংশ); গুই (বহু 'গোমিন' বা গরুর অধিকারী) ইত্যাদি)। **স্থানবাচক** শব্দ হইতেও বংশপদবীর উদাহরণ মেলে, যথা, **ঘোষাল** ('ঘোষালয়' গ্রামের অধিবাসী), মুখোপাধ্যায় ('মুখোটী' গ্রাম হইতে) ইত্যাদি। বৃত্তি ও খেতাব হইতে বহু বংশ পদবীর উৎপত্তি; যথা, নস্কর, উকিল, হাজরা (হাজার সৈন্যের নেতা), চক্রবর্তী প্রভৃতি। **জাতি নাম** ও বহুক্ষেত্রে বংশপদবী হিসেবে চলে আসছে, যথা, কর্মকার, কোলে, জোলা, পোদ (পৌণ্ড্রিক) বরুই, কয়াল প্রভৃতি। **"বেদ"**-এর নাম থেকেও বংশপদবীর উদাহরণ বিরল নয়; যথা, 'চৌবে' বা 'চতুর্বেদী', ত্রিবেদী ইত্যাদি। **গোত্র** নাম থেকেও বংশপদবী গড়ে উঠেছে' যথা, অক্রুর রুইদাস। দুইপদবিশিষ্ট বংশপদবীর দৃষ্টান্ত যথেষ্ট দেওয়া যায়, যথা, ঘোষ চৌধুরী; দে-সরকার; মিত্র-মজুমদার; বসু মল্লিক; দাশগুপ্ত, সেনগুপ্ত রায় চৌধুরী, সাধুখান প্রভৃতি।

'সারনেম' বা বংশপদবীর রেওয়াজ শুধু বাংলায় নয়, অনেক প্রদেশেই আছে। **উত্তর-প্রদেশের বংশপদবী ঃ** যথা, আগরওয়াল (অগ্রবাল), বাজগাই, ভার্গব, ভাটিয়া, পাঠক, পুরী, খান্না, তিউয়ারী, মাথুর, মেহ রোত্রা, মিশ্র, পন্থ, বৈশ (Vais), যাদব, অগ্নিহোত্রী, বক্সী, ত্রিপাঠী প্রভৃতি। বর্তমানে অনেকের মধ্যে উক্ত বংশপদবী বর্জন করবার রেওয়াজ দেখা যাচ্ছে উত্তর প্রদেশে। **পার্শীদের** বৃত্তনাম বা খেতাব বংশপদবী হিসাবে ব্যবহৃত হয় অনেক ক্ষেত্রে ঃ যথা, মেথোরা, মেহ্‌তা, দস্তুর, পিঠাওয়ালা, এনাজনিয়ার প্রভৃতি। **পাঞ্জাবী নামে** দেখা যায় ব্যক্তিগত দ্বিপদ বিশিষ্ট নামের 'পদান্ত' আলাদা ভাবে লেখা হলেও ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগের বাঙ্গালী নামের মত উক্ত পদান্তগুলি বংশপদবীতে পরিণত হয় নাই আজও; যথা। শিও পরসাদ; রাম অওতার, বন্‌শী লাল, তারা চাঁদ, গিয়ান চাঁদ, কলিয়ান দাস। তবে পাঞ্জাবী নামে গোষ্ঠী নাম (Tribal name) বংশপদবী হিসেবে প্রয়োগ হয়, যথা, বালোচ, ভাট্টি, ছক্‌রী, ছিব, দস্তী, দোগরা, গারেওয়াল, গিল, লাম্বা, কোরেশী, সান্ধু, সিন্ধু, শেঠী, রানধোয়া, রঙ্গা প্রভৃতি। **শিখদের নামে**-ও অনেক ক্ষেত্রে গোষ্ঠী নাম বা 'ক্লান নেম'এর প্রয়োগ আছে বংশপদবী হিসাবে; যথা, আছন্‌ওয়ালা, অমৃতসরওয়ালা, বাপ্পা, হাসানওয়ালা, লাম্বা, সিন্ধানওয়ালিয়া, সিংপুরিয়া, কলিয়ানওয়ালা, থেপুরিয়া, রামপুরিয়া প্রভৃতি। **মারাঠী ও গুজরাতী নামেও** 'সারনেম' বা বংশপদবী আছে; যথা, তিলক, গোখ্‌লে, গান্ধী প্রভৃতি।

কিন্তু, দ্রাবিড় নামে বংশ নাম বা 'সারনেম' নাই। জাতিনাম, যথা, রাও, আয়ার, আয়াঙ্গার নায়ার, প্রভৃতি—এগুলি ব্যক্তিগত নামের অধীনে যুক্ত হয়। যেমন, কৃষ্ণস্বামী **আয়াঙ্গার**, মঙ্গেশ **রাও** প্রভৃতি। তবে কোন কোন দক্ষিণ ভারতীয় নামে দেখা যায় জাতি নামকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং ব্যক্তিগত নাম বা forename শুধু আদ্যাক্ষরে লেখা। যথা, বি, কে, পি, রাও; এখানে রাও পদবীটীকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং ইহাকে 'সারনেম' হিসেবে প্রয়োগ করেছেন উক্ত নামধারী ভদ্রলোক।

'সারনেম' এর রেওয়াজ **আসামের অধিবাসীদের** নামেও আছে। যথা, বরুয়া, কাকতি, বোরা, গোহেন, দোয়েরা, বরদলই, মেধি, লস্কর, বরকাকতি, বরভুইয়া। চৌধুরী, হাজারিকা প্রভৃতি মোগলাই খেতাবও অসমীয়াদের মধ্যে 'সারনেম' হিসেবে ব্যবহৃত হয়

ওড়িয়াদের নামেও দেখা যায় মহান্তি, ত্রিপাঠি, মহাপাত্র, রথ, নায়েক, পাচি, প্রুস্তি,

সংপতি, পড়িডা, সাহু, পাত্র, পটনায়ক, প্রধান, জানা, বারিক, পাণ্ডা প্রভৃতি শব্দ 'সারনেম' হিসেবে প্রচলিত।

ইংরেজী ভাষায় লিখ্‌বার সময় উপরি উক্ত সকল প্রকার 'সারনেম' বা 'সারনেম' হিসেবে প্রচলিত সকল শব্দ নানা বানানে দেখা যায়। তবে মূল শব্দগুলির মধ্যে বৈষম্য নাই। অবশ্য মূল শব্দ ও পরিভাষাগত বিকৃত শব্দ কখনো কখনো উভয় শব্দই 'সারনেম' হিসেবে চলে আস্‌ছে। হোম, সোম; হোর, শোর, শূর; আদিত্য, আইচ; সিংহী, শী; হাতী, হাইত।

ব্যক্তিগত নাম

বাঙ্গলী নাম। বাঙ্গালীদের একটী ব্যক্তিনাম এবং ঐ ব্যক্তিনামের পরিচিত শব্দ হিসেবে 'সারনেম' (বংশ, জাতি, বা গোত্র নাম) উক্ত নামের পরে ব্যবহৃত হয়। যদি একই 'সারনেম' ওয়ালা ব্যক্তিনাম দুই বা ততোধিক লোকের মধ্যে দেখা যায়, তখন আরও পরিচিত চিহ্ন স্বরূপ জন্ম তারিখ বা খেতাব প্রভৃতি নামের সঙ্গে যোগ ক'রে দেওয়া হয়। বাঙ্গালী ব্যক্তিনামের পরিচিত হিসেবে পিতার নাম বা জন্মস্থানের নাম যোগ করা হয় না।

উত্তরপ্রদেশের অধিবাসীদের নাম ঃ ব্যক্তিনাম উত্তরপ্রদেশে অধিকাংশক্ষেত্রেই দুইপদ বিশিষ্ট এবং ব্যক্তিনামের সঙ্গে পরিচিত শব্দ হিসেবে 'সারনেম' যোগ করার প্রচলন আছে। তবে, বর্ত্তমানে 'সারনেম' বর্জ্জনের রেওয়াজ দেখা যাচ্ছে, ফলে ব্যক্তিনাম দুইটী পৃথক পৃথক পদ হিসেবে পাশাপাশি লেখা হয়। এইভাবে ব্যক্তিনাম লেখার দরুণ দ্বিতীয় পদটী 'সারনেম' হিসেবে ভুলকরা স্বাভাবিক। যথা, "শ্রীমান নারায়ণ অগ্রবান" এর 'অগ্রবান' বর্জ্জন কর্লে দাঁড়ায় 'শ্রীমান নারায়ণ'। এই 'নারায়ণ'কে সারনেম হিসেবে ধরাও বিচিত্র নয়। এইভাবে "রাজেন্দ্র প্রসাদ শ্রীবাস্তব" এই নামের 'শ্রীবাস্তব' বর্জ্জন করার ফলে "রাজেন্দ্র প্রসাদ" এইরূপ হ'য়েছে। এই নামটীর "প্রসাদ" পদটীকে (আদিতে 'পদান্ত' ছিল) 'সারনেম' হিসেবে ধরা হ'চ্ছে। পশ্চিম ভারতে ব্যক্তিনামের পরিচিত শব্দ হিসেবে পিতার নাম জুড়ে দেওয়া হয়। এটা অবশ্য পারসিক ও আর্‌বী নামকরণ পদ্ধতির অনুকরণ (মহম্মদ বিন্ কাশেম=কাশেমের পুত্র মহম্মদ), কারণ উক্তনামে ব্যক্তিনামের পর **বিন্** বা **ইবন্** শব্দের পর পিতা বা পিতামহের নাম যোগ ক'রে দেওয়া হয়, কিম্বা আবু শব্দের পর কেবল পিতার নাম লিখে ব্যক্তি পরিচয় দেওয়া হয়। ঐরূপ অনুকরণে **মারাঠী** ও **গুজরাতী নাম** গঠনের দৃষ্টান্ত যথেষ্ট আছে। **মারাঠী নাম ঃ "গোপাল কৃষ্ণ"** গোখ্‌লে (**গোপাল**—নামধারীর ব্যক্তিগত নাম; **কৃষ্ণ**—তাহার পিতার নাম) **গুজরাতী নাম ঃ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী**, এখানেও নামধারীর ব্যক্তিগত নামের পর পিতার নাম লেখা হ'য়েছে।

দক্ষিণভারতে ঃ ব্যক্তিগত নামের পরিচিতি হিসেবে পশ্চিম **দ্রাবিড় অঞ্চলে** ঐ নামের **পূর্ব্বে** গ্রামের নাম বা 'ট্রাইবেল' থাকে এবং পরে পিতার ব্যক্তিগত নাম জুড়ে দেওয়া হয়। **কানাড়ী অঞ্চলে** ব্যক্তিগত নামের পর পিতার নাম থাকে না, গ্রামের বা জন্মস্থানের নাম এর পর ব্যক্তিগত নাম থাকে এবং তার সঙ্গে অধীনভাবে জাতিনাম জুড়ে দেওয়া হয়; যথা, সব্বুর মঙ্গেশ রাও (**সব্বুর**—জন্মস্থানের নাম; **মঙ্গেশ**—ব্যক্তিগত নাম; **রাও**—জাতিনাম)।

পাঞ্জাবীদের ব্যক্তিগত নাম সাধারণতঃ দুইপদ বিশিষ্ট এবং পদ দুইটী আলাদা ভাবে পাশাপাশি লেখা হয় (সমানানিষ্পন্ন একপদ হিসেবে নয়) ঃ যথা, শিও পরসাদ; মুরলীধর;

শিওদিয়ান; তারাচাঁদ; গিয়ান চাঁদ প্রভৃতি। পাঞ্জাবী নামের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে গোষ্ঠী নাম বা Clan name যুক্ত থাকে 'সারনেম' হিসেবে; যথা, দস্তি, গিল, দোগ্‌রা, শেঠী, সিন্ধু সিম্‌রা, তুরাণ প্রভৃতি।

তেলেগু এবং মালয়ালাম অঞ্চলে ব্যক্তিগত নাম এর **পূর্ব্বে** বংশনাম (house name) ব্যবহৃত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নামের **পরে** জাতিনাম যোগ ক'রে দেওয়া হয় : **মালয়ালাম নাম :** চেত্তুর শঙ্করণ নায়ার। **তেলেগু নাম :** সর্ব্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন্‌।

তামিল অঞ্চলে ব্যক্তিগামের **পূর্ব্বে** এক বা ততোধিক শব্দ থাকে। একটী শব্দ থাকিলে সেটী সাধারণতঃ জন্মস্থান বা পৈত্রিক বাসস্থানের নাম। দুইটী শব্দ থাকিলে দ্বিতীয়টী পিতার ব্যক্তিনাম এবং প্রথমটী জন্মস্থানের নাম। আবার কয়েক ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেকে জন্মস্থান ও পিতার ব্যক্তিনাম পূর্ণভাবে না লিখে আদ্যক্ষরে লিখে থাকেন এবং তারপর নিজের ব্যক্তিনাম পূর্ণভাবে লিখেন; যথা; ভি. এস্‌. শ্রীনিবাসাশাস্ত্রী।

পার্শীদের ব্যক্তিনামের পর পিতার ব্যক্তিনাম লেখা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে বৃত্তি বা জাতিনামও সর্ব্বশেষে যোগ করা হয়। যথা, দীনশ' রুস্তমজি মেথোরা; মাণিকজি বাজান্‌জি পিঠাওয়ালা।

শিখ্‌দের ব্যক্তিনামের সঙ্গে "সিং" যুক্ত থাকে, তবে কয়েক ক্ষেত্রে দেখা যায় গোষ্ঠী নামও সবশেষে থাকে। এই গোষ্ঠী নামকে 'সারনেম' হিসেবে প্রয়োগ করা চল্‌তে পারে এবং চলেও। যথা, আহ্‌লুওয়ালা, দিয়ালপুরিয়া, থেপুরিয়া, তালবন্দি, তোতাঘিয়া ইত্যাদি।

ভারতীয় নামের সমস্যা এই যে বিভিন্ন অঞ্চলে ও ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে নামগঠনের ধারা স্বতন্ত্র। ব্যক্তিনামের পরিচিত হিসেবে স্থান, পিতার নাম, খেতাব, জাতি ইত্যাদি অনেক কিছুই জুড়ে দেওয়া হয়; কিন্তু এসবগুলোর আপেক্ষিক পারম্পর্য্য (relative succession) সর্ব্বত্র এক ধরণের নয়-বা ব্যক্তিগত নাম, কোনটী পিতার নাম, বা জন্মস্থান, খেতাব প্রভৃতির নাম সব সময় ঠিক করা মুস্কিল।

দ্বিতীয় সমস্যা বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষার সাহায্যে গঠিত নামের নানা রূপ :—কৃষ্ণচন্দ্র, কার্যনচাঁদ প্রভৃতি। এগুলিকে অর্থগতভিত্তিতে একরূপী করলে বিভ্রাট বাধে।

তৃতীয় সমস্যা, রোমলিপি বা বিদেশী লিপির মাধ্যমে আসল নামের রূপ শুধু বদ্‌লে যায় না—একই নামের নানারূপ দেখা যায় কোন বিশেষ নিয়ম অনুসরণ না করার দরুণ। নামধারী ব্যক্তি নিজের নাম খেয়াল খুশীমত পাশ্চাত্যধরণে, বানানে ও রোমকলিপিতে অনেক সময় লিখে থাকেন। খুশীমত নাম বিকৃতিও করেন। একই লেখক ভারতীয় ভাষায় লেখেন এক-ধরণে আর রোমকলিপিতে লেখেন অন্য ধরণে। যথা, "অনিল চন্দ্র ঘোষ" ইংরাজীতে লিখ্‌বার সময় লেখেন Oneil Chunder Gosse. "অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী"কে দেখা যায় "Ordhendra Coomar" রূপে (Ardhendra Kumar নয়)। এসব নাম সংক্ষেপ কর্লে দাঁড়ায় O. C. Gosse, O. C. Ganguli. এসব নামকে বিকৃত নিয়ম মাফিক বানানে বা translitrationএ (যথা Anil Chandra, Ardhendra Kumar) লেখকের পরিচিতির বিকৃতি ঘটে, কারণ অর্দ্ধেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলী তাঁর সব ইংরেজী বইএ Ordhendra Coomar (O. C.) Consistently লিখে থাকেন।

তবে 'সারনেম' যদি একাধিক বানানে বা ভঙ্গীতে লেখা হয় তবে আরও বিভ্রাট ঘটে ডাইরেক্টরী বা ক্যাটালগ্‌ দেখ্‌বার সময়। যথা Mukherjee এই পদবীর ২১ রকম বানান

দেখা যায় রোমক হরফে। এক্ষেত্রে কি কর্ত্তব্য? ইংরেজী নামের মত এগুলি ব্যক্তিনামের বিশেষ পরিচিতি সূচক 'সারনেম' নয়, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলি জাতি, স্থান বা বৃত্তিবাচক শব্দ বা পদবী। ভারতীয় ভাষায় এগুলির প্রত্যেকটীর রূপ একই ধরণের। সুতরাং বিভিন্ন বানানে বা ভঙ্গীতে লেখা এসব শব্দ সর্ব্বস্বীকৃত এক বানান বা রূপে রোমকহরফে লিখলে সকলেরই সুবিধা হয়। যথা, ২১ রকম Mukherjee (Mookerjea প্রভৃতি) কে একরকম বানানে (Mukharji) লেখা চল্‌তে পারে। তবে ব্যক্তিগত নাম Ordhendra Coomarকে একটী সর্ব্বস্বীকৃত বানানে লেখার অধিকার আমাদের নাই, কারণ ইংরেজীতে লেখা বইএ লেখকের পরিচিতি হচ্ছে লেখকের ব্যবহৃত নিজর ব্যক্তিগত নামের বানানে।

তবে যাঁরা 'সারনেম'কে শুধু ইংরেজী বানানে না লিখে একেবারে পাশ্চাত্য ধরণে বিকৃত ক'রে লিখে থাকেন সেসব 'সারনেম'এর সর্ব্বস্বীকৃত ষ্ট্যাডার্ড রূপ দিতে যাওয়া মুস্কিল, যথা, Bonnerjee, Tagore. এগুলি মূল দেশী শব্দের ইংরেজী বানান নয়, ইংরেজী বিকৃতি। এই বিকৃতি রূপ উক্ত পদবীধারীর বিশেষ পরিচিতি জ্ঞাপক অন্ততঃ তাঁদের লেখা ইংরেজী পুস্তকের বেলায়। রবীন্দ্রনাথের ইংরাজীতে লেখা সকল পুস্তকে তার পদবী বিকৃত করা হ'য়েছে Tagore হিসেবে (ইহা ঠাকুরের transliteration বা ইংরেজী বানান নয়)। সুতরাং তাঁর লেখা ইংরেজী বইএর সূচী প্রণয়ন করবার সময় Tagore, Rabindranath না লিখে Ravindranatha Thakura বা Thakur, Ravindranath লিখ্‌লে ভুল করা হবে। এমনিভাবে W. C. Boanerjee (Woomes Chunder Bonnerjee কে) Banerjee লিখ্‌লে লেখকের পরিচিতির ব্যাপারে বিঘ্ন ঘটে—বিশেষতঃ তাঁর রচিত ইংরেজী পুস্তকের বেলায়।

বহুপদবিশিষ্ট ভারতীয় নামের কোন পদবী কোন অঞ্চলে আসল নাম হিসাবে ব্যবহৃত তাহা বোঝা বিদেশীদের পক্ষে এমনকি অঞ্চলান্তরের ব্যক্তিদের পক্ষে সহজ নয়। এ সকল ক্ষেত্রে আঞ্চলিক নামের (অন্ততঃ ব্যক্তিগত নাম, বংশপদবী বা 'সারনেম' এর) সূচী প্রণয়নের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

এ প্রবন্ধে শুধু হিন্দু নামের কথাই বলা হ'ল। মুসলমান নামের আদি গঠনের পরিচয় পেতে গেলে আরবী ও পারসিক নামের গঠনপ্রণালী সম্যকভাবে জানা দরকার। দুঃখের বিষয় ভারতীয় ও পাকিস্থানী মুসলমানদের নামের Standard রূপ সম্বন্ধে কোনও বাঁধা ধরা নিয়ম করা মুস্কিল। পুরো নাম অবিকৃত ভাবে লেখাই বিধেয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে বিশিষ্ট নামধারী ব্যক্তি নামের কোন বিশিষ্ট অংশকে খেতাব বা 'সারনেম' হিসেবে ব্যবহার ক'রেছেন সেই অংশই তাঁর নামের বিশেষ পরিচিতি জ্ঞাপক। যথা Khawaja Ghullum-us-Sayadain নিজের নাম লেখেন K. G. Sayadain. এখানে Sayadain কে surname হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, যথা Sayadain, K. G. ইংরাজীতে লেখা একই মূলগত নামের বিভিন্ন বানানকে রোমকহরফে এক বানানে লেখা অসঙ্গত হবে না। Muhammed, Mohammed প্রভৃতি বিভিন্ন বানানকে এক বানানে লেখা সম্ভব ও যুক্তিযুক্ত।

শিশিরকুমার

রাখাল ভট্টাচার্য

দূরের জিনিষ কাছে নিয়ে আসার যে শিল্পকর্ম তারই নাম অভিনয়। স্মরণাতীত কাল আগের রামসীতার কাহিনীই হোক, দুশো, পাঁচশো হাজার দুহাজার বছর আগের ঐতিহাসিক ঘটনাই হোক আর বর্তমানের অদৃষ্ট কোন বিষয়ই হোক, যে ঘটনা ঘটেছে দূরে, চোখের আড়ালে অথবা কেবলমাত্র—লেখকের মনোজগতে,—স্থান-কাল কিংবা অলীকতার ব্যবধানে—তাকে আমাদের চোখের সামনে ধরে অভি (কাছে) নয়তি (নিয়ে আসে)—এই অভিনয়ের উদ্দেশ্য।

এই অভিনয়ন কাজ একক প্রচেষ্টায় সিদ্ধ হতে পারে না। একজন পেশাদার নট নিজের অংশটুকু সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে তৃপ্ত হতে পারেন; কিন্তু কোন নাট্যশিল্পীর পক্ষেই তা সম্ভব নয়। তাই শিশিরকুমার মোটা মাইনের চাকুরে নট হয়ে স্বচ্ছন্দ ও স্বাচ্ছন্দময় জীবনযাপনের সম্ভাবনাকে পদদলিত করেছেন। তার বদলে নাটক যাতে প্রকৃত অভিনীত হতে পারে তার জন্য আজীবন নানা বাধা-বিপত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে নিঃশেষ হয়ে গেছেন, বোধ হয় তাঁর দৈহিক সত্ত্বা নিঃশেষ হবার আগেই।

কবি ও লেখক তাঁদের রচনা রেখে যান, গায়ক অন্তত কিছু সুর রেখে যেতে পারেন, কিন্তু "দেহপট সনে নট সকলি হারায়," তিনি রেখে যান শুধু স্মৃতি। যাদের যৌবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলি শিশিরকুমারের অভিনয়শিল্পে আনন্দময় হয়ে উঠেছিল, জীবন মনে হয়েছিল সার্থক, তাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সেই মধুর স্মৃতিও যাবে মিলিয়ে। তবু যতক্ষণ তা যায়নি ততক্ষণ সে স্মৃতির রোমন্থনেও কী আনন্দ!

ইন্‌ষ্টিট্যুটের শিশিরকুমার, ম্যাডান থিয়েটার্সের শিশিরকুমার, ক্যালকাটা এগ্‌জিবিশনের শিশিরকুমার, অ্যালফ্রেড মঞ্চের শিশিরকুমার বাঙ্‌লার আপামর সাধারণের কাছের মানুষ, অতি প্রিয়জন হয়ে উঠ্‌লেন মনোমোহন থিয়েটারে "নাট্যমন্দির" প্রযোজিত "সীতা" নাটকে।

তারই আগে আর্ট থিয়েটার সম্প্রদায় কর্তৃক ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত "কর্ণার্জ্জুন" ও "ইরাণের রাণী"তে নাটকীয় দৃশ্যপট, মনভোলানো আলোকসম্পাত, ঐতিহ্যসম্মত পোষাক-পরিচ্ছদ এবং স্বাভাবিক কথাবলার ঢঙে গৈরিশী অমিত্রাক্ষর আবৃত্তি কলকাতার পেশাদার নাট্যশালায় চমক লাগিয়েছে। অথচ পেশাদার রঙ্গমঞ্চে পাকাপাকিভাবে আসীন না হয়েও এই নব নাট্যধারার প্রবর্তক হিসেবে শিশিরকুমার তখন সমগ্র শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান সমাজের সকলের মুখে মুখে। শিশিরকুমার যখন "সীতা" নিয়ে পাকাপাকিভাবে রঙ্গমঞ্চ অধিকার করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন সে কী অধীর আগ্রহ! ইতিপূর্বেই যাঁরা শিশিরকুমারের অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেছে তারা তখন সকলের ঈর্ষার পাত্র।

কিন্তু শিশিরকুমারের ভাগ্যবিধাতা তাঁকে মসৃণ পথে চলবার ভবিতব্য ললাটে লিখে পাঠাননি সংসারে। বন্ধুর পথে চলার ফলেই তাঁর চরিত্র দৃঢ় হয়েছিল কিনা জানি না, তবে দৃঢ়তা প্রকাশের সুযোগ ঘটেছিল। সেই দৃঢ়তারই পরিণতি দেখেছি শেষজীবনে চরমদারিদ্র্যের মধ্যেও অশিল্পের সঙ্গে রফা করার অস্বীকৃতিতে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকের তখন বিরাট খ্যাতি, তাঁর অধিকাংশ নাটকই ততদিনে নাট্যশালার ক্ল্যাসিকে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বীরত্বব্যঞ্জক অতুলনীয় গদ্যের রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলাল

মিত্রাক্ষরী ছন্দে যে "সীতা" নাটকখানি লিখেছিলেন, সেখানি কিন্তু তখনও অনভিনীত।

একমাত্র দুরন্তসাহসী শিশিরকুমারের পক্ষেই সম্ভব সেখানা সাধারণ মঞ্চে অভিনয় করা। ক্যালকাটা এগ্‌জিবিশনের মেরাপীমঞ্চ থেকে পাকা মঞ্চে পৌঁছবার পথেই কিন্তু বাধা পড়লো, আর তারই ফলে দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা" নাটকখানি আবার নাট্যসাহিত্যে পর্যবসিত হল, অভিনয়সমৃদ্ধ জীবন্ত নাটক হয়ে উঠ্‌বার পথেই অকালে তার যাত্রা হল বন্ধ।

আর্ট থিয়েটার নতুন টেকনিকে নাটক প্রযোজনা করে বাজার মাৎ করছে, এবং পেশাদার রঙ্গমঞ্চে এবিষয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে বিরাজ করছে। শিশিরকুমার পেশাদার রঙ্গমঞ্চে স্থায়ীভাবে অভিনয় সুরু করবেন, "কর্ণার্জ্জুন"এর প্রতিদ্বন্দ্বী হবে "সীতা"—এই খবরে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের দুজন প্রভাবশালী ডিরেক্টর শিশিরকুমারকে জব্দ করবার জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "সীতা"র অভিনয় স্বত্ব কিনে নিলেন গোপনে।

শিশিরকুমার তাতে কতখানি প্রমাদ গুণেছিলেন জানি না, তবে জনসাধারণ গুণেছিল; কারণ, প্রথম অভিনয় রজনী পিছিয়ে গেলেও "সীতা" নাটক দিয়ে মনোমোহন নাট্যমন্দির উদ্বোধন হবে এই ঘোষণায় সকলেই ভয় পেয়ে গেল—এ নিয়ে কোর্ট-কাছারী, মামলা-ইন্‌জাংশান একটা কিছু জটিলতার সৃষ্টি হবে। যাঁরা দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা"র অভিনয় স্বত্ব কিনে গ্যাট হয়ে বসেছিলেন, তাঁরাও বিজ্ঞাপন দেখে ভয় পেলেন, বেয়াড়া লোকটা করে কি?

সত্যিই তাজ্জব ব্যাপার দেখলো সবাই যখন একেবারে আন্‌কোরা নূতন "সীতা" মঞ্চস্থ হল অজ্ঞাতনামা যোগেশ চৌধুরীর রচিত। আর্ট থিয়েটার ঘোষণা বিজ্ঞাপিত করেও কোনদিন দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা" মঞ্চস্থ করেনি, অন্য কেউও করেনি। আর যোগেশ চৌধুরী যে প্রতিষ্ঠা পেলেন, তাতে সমৃদ্ধ হল বাঙ্‌লার নাটক ও নাট্যশালা দুই-ই।

শিশিরকুমার পরিবেশিত যোগেশ চৌধুরীর সীতায় চমকলাগানোর অবকাশ ছিলনা। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডকে এবং রামসীতার মনোবেদনাকে তিনি দর্শকসমক্ষে মূর্ত করে তুললেন। সে সময়কার শিল্পী, কবি, গায়ক সবাই এসে হাত মেলালেন শিশিরকুমারের সঙ্গে—চারু রায় দৃশ্যপটের ভার নিলেন, নৃত্যপরিকল্পনা করলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, গান রচনা করলেন হেমেন্দ্রকুমার রায় আর তা ধ্বনিত হল কৃষ্ণচন্দ্র দে'র কন্ঠে। আরও এলেন অনন্যসাধারণ অভিনয় প্রতিভা নিয়ে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য কবির্ষি বাল্মীকি এবং প্রফুল্ল রায়—যাজ্ঞিক শূদ্র।

গিরিশচন্দ্রের যুগের পর নাট্যশালা সমাজ শিরোমণিদের কাছে রাত্য হয়ে উঠেছিল। শিশিরকুমারকে কেন্দ্র করে আবার সেখানে মহামনীষীদের আনাগোনা সুরু হল। সর্বত্র উৎসাহ ও আগ্রহের প্লাবন জাগ্‌লো, যেন এই বিশেষ ক্ষেত্রে নতুন এক রেণেসাঁ। রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র সবাই এগিয়ে এলেন শিশিরকুমারের পাশে, আশীর্বাদ সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা নিয়ে। কলকাতার প্রথম মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করলেন এবং শিশিরকুমারকে অনুরোধ জানালেন তার ভার নিতে।

"সীতা" নাটকে ঐতিহ্য ও শিল্পশাস্ত্র সম্মত দৃশ্যপট ও সাজপোষাক, অনবদ্য টিমওয়ার্ক, নাচগান ও আলোক সম্পতের শিল্পসম্মত সামঞ্জস্য প্রযোজক ও অভিনয় শিক্ষক শিশিরকুমারকে প্রতিষ্ঠা দিল। যোগেশচন্দ্রের 'সীতা' নাটকে "রাম" চরিত্র-চিত্রণ সম্পর্কে আমার অজস্র আপত্তি আছে, কিন্তু সীতার প্রয়োগনৈপুণ্য বাঙলা নাট্যশালার বিলাসের পথে যে কতবড় পদক্ষেপ, তা যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী তাঁরা সকলেই জানেন।

শিশিরকুমার প্রথম কবে নাট্যমঞ্চে আবির্ভূত হলেন, কখনো নাটক মঞ্চস্থ করেছেন, তার পারম্পর্যই বা কি, শিশিরকুমারের মনীষা অবদানের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দানে সে তালিকা অবান্তর।

বিদ্যা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও প্রকৃত রসবোধ নিয়ে তিনি নাট্যশালায় যোগ দিয়ে তাকে নতুন মর্যদা দান করেছিলেন।

পৌরাণিক 'সীতা' সামাজিক 'ষোড়শী', ঐতিহাসিক 'দিগ্বিজয়ী', লিরিক "বিসর্জন", নক্সাজাতীয় 'রীতিমত নাটক' শিশিরকুমারের প্রয়োগ প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ব্যক্তিগত অভিনয় হিসেবে রঘুবীর, আলমগীর, রাসবিহারী প্রভৃতি আরও বহু চরিত্রায়ণ সে যুগের মানুষের মনে আঁকা হয়ে আছে।

শিশিরকুমারের প্রয়োগশিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য পরিবেশ সৃষ্টি, যার জোরে দর্শক স্থান কালের ব্যবধান বিস্মৃত হয়ে আসল ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শন লাভ করতো। তাঁর অভিনয়শিক্ষণ-দক্ষতার প্রমাণ তাঁর প্রয়োজিত নাটকে টিমওয়ার্কের সাফল্য। হাঙ্গব্যাক অব্ নৎরদাম-এর রূপান্তর 'পুণ্ডরীক' নাটকে শিশিরকুমার, নরেশচন্দ্র ও তারাসুন্দরীর সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করেছিলেন কুঁজো কাশীমদের চরিত্রে অজ্ঞাতনামা গোপাল ভট্টাচার্য ও নর্তকী রুস্তানার ভূমিকায় ব্যালেগার্ল চারুশীলা।

পরিবেশ সৃষ্টির চূড়ান্ত নিদর্শন ছিল নাদির শাহের ভারত আক্রমণ নিয়ে রচিত নাটক 'দিগ্বিজয়ী'। শিশিরকুমার প্রয়োজিত যোগেশ চৌধুরীর দ্বিতীয় রচনা এই 'দিগ্বিজয়ী' বাঙলা ভাষার একখানি উচ্চাঙ্গের নাটক। উন্নাসিক সম্প্রদায় অবশ্য দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' ছাড়া বাঙলা ভাষায় সত্যিকার নাটকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। আর রবীন্দ্রনাথের নিন্দা করলে সমাজে অপাঙক্তেয় হবার ভয় আছে বলেই তাঁর নাটকগুলিকেও মেনে নিতে হয়।

যে যাই বলুন, 'দিগ্বিজয়ী' নাটকে মেষপালক নাদির সাহের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পিছনে যে ঐতিহাসিক যুক্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তার মূল কোথায় জানিনা, তবে ইতিহাসের রথচক্রের গতি নিয়ন্ত্রণ কিসে হয় তার একটা বিজ্ঞানসম্মত আভাস দেবার প্রচেষ্টা আমরা তাতে দেখেছিলাম। বিশেষকরে ওয়ার্লড ফোর্স কি ভাবে কাজ করে তার ইঙ্গিত বোধ হয় বাঙলা সাহিত্যে এই নাটকখানির মাধ্যমেই প্রথম স্বীকৃতি পেয়েছিল ঃ "তোমার আমার লাভ ক্ষতি খতিয়ে কোন কাজ হবেনা... নিখিল জাতির মর্ম-মথিত করে কর্মস্রোত বয়ে চলেছে... তোমার আমার স্বার্থ তার অনুকূল হয়ে থাকবে, নয়তো কোথায় তলিয়ে যাবে কে তার খোঁজ রাখে"। দীর্ঘপরাধীনতা পাশে জাতি কতখানি নির্বীর্য হয় তার প্রমাণ, নাদির যখন বলছে; এত আঘাত, এত অত্যাচার করছি তবু একটা বিদ্রোহ দেখা দিলনা, এমনই মরে গেছে সারা জাতটা।

নাটকখানি সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে অনেকেরই বিশ্বাস শিশিরকুমার কর্তৃত্ব প্রযোজিত হবার জন্য লিখিত নাটকের রচনায় তাঁর নিজের অংশ ছিল অনেকখানি।

এই নাটকের টিমওয়ার্কও অনবদ্য ছিল। আলি আকবর রূপী যোগেশ চৌধুরী, মোল্লা বাসীর ভূমিকায় অমলেন্দু লাহিড়ী, নেক কদম হিসেবে নৃপেশ রায়—এঁদের অভিনয় প্রতিভা তখন প্রতিষ্ঠিত না হলেও তাঁদের অভিনয় হয়েছিল অতুলনীয়। আর সালেহ বেগ চরিত্রের অভিনয় বোধ হয় বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর নটজীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। কৃষ্ণভামিনী ও চারুশীলার কথা বিশেষ করে বলছিনা, কারণ তাঁরা দুজনেই তখন সুপ্রতিষ্ঠাসম্পন্না অভিনেত্রী।

পরিবেশ সৃষ্টির শিল্পমূল্যায়নের চেষ্টা না করেও বলতে পারি, চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর একটি পুঁথিগত প্রাণ ছাত্র এই নাটক দেখার পরদিন শ্যামবাজার থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত লেফট রাইট করে ঘুরে এসেছিল—সামরিক নাট্যাভিনয়দর্শনের উদ্দীপনায়।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের লিরিকধর্মী অভিনয়রীতিই গ্রহণ করেছিলেন শিশিরকুমার। আমি বিশেষজ্ঞ নই, তবু জোর করেই বলবো শিশিরকুমারের প্রয়োজনা-জীবনের শ্রেষ্ঠকীর্তি রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন এবং অভিনয়জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি জয়সিংহ। বোধ হয় শিশির প্রতিভার লিরিক ধর্মীতার জন্যই তা হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে নাটকখানির কিছু রূপান্তর করে এনে তা মঞ্চস্থ করেছিলেন শিশিরকুমার। প্রথমে তিনি নামেন রঘুপতির ভূমিকায়, জয়সিংহ সাজেন ' রবিরায়। অনেক বিদগ্ধ ও রসিকজন মন্তব্য করলেন, জয়সিংহ চরিত্রই শিশির প্রতিভার উপযুক্ত বাহন রঘুপতি নয়। জানিনা এর সঙ্গে কবিগুরুর নির্দেশও ছিল কিনা তবে কয়েক রাত্রির অভিনয়ের পরেই 'বিশ্বনাথ ভাদুড়ীকে রঘুপতির অংশ দিয়ে শিশিরকুমার নিজে হলেন জয়সিংহ।

রক্তপাতের বিরুদ্ধে চিরন্তন মানবীয় আবেদন এমনভাবে আর কখনও ধ্বনিত হয়েছে বলে জানিনা। তবে 'বাশি যদি সত্যই কাঁদিত বেদনায়, থেমে গিয়ে মূক হয়ে রহিত অনন্তকাল ধরি" অথবা "দক্ষিণ বাতাস যদি বন্ধ হয়ে যায়, ফুলের সৌরভ যদি নাহি আসে, দশদিক জেগে ওঠে দশটি সন্দেহ সম, তখন কোথায় সুখ!" ইত্যাদি কাব্যপ্রকাশ কীভাবে জীবন্ত বাস্তব হয়ে উঠতে পারে তা যাঁরা শিশিরকুমারের জয়সিংহ দেখেছেন তাঁরাই শুধু উপলব্ধি করতে পারবেন। ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তবে আজও সেই অভিনয় দেখার স্মৃতি মনে হলে রোমাঞ্চ জাগে, সমগ্র অন্তর লিরিকের রসে আপ্লুত হয়ে যায়।

জয়সিংহ এর আগে রবীন্দ্রনাথ নিজে অভিনয় করেছিলেন, কাজেই শিশিরকুমারের পক্ষে চরিত্রের রহস্যানুসন্ধানে কোন সমস্যা ছিলনা। চরিত্র ইন্টারপ্রেট করার ব্যাপারে শিশিরকুমারের শ্রেষ্ঠ কীর্তি চাণক্য।

দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ নাট্যরচনা চন্দ্রগুপ্ত, যার মধ্যে হৃদয়হীন শুষ্ক মস্তিষ্কবাদের ব্যর্থতা মূর্ত করেছেন নাট্যকার চাণক্য চরিত্রে। এই চাণক্য পদে পদে প্রেয়সীর নির্দেশ চায়, তারই দ্বারা চালিত হয়। অথচ এই প্রেয়সী কে, তার নির্দেশ কোন অভিনেতার অভিনয়েই ইতিপূর্বে ধরা পড়েনি, সেই অশরীরী প্রেয়সীকে কেউবা উইংসের ধারে খুঁজেছেন কেউবা খুঁজেছেন স্টেজেরই অন্যত্র। এমনকি প্রথম চাণক্য দানীবাবু, স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলাল যাঁর অভিনয় দেখে মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন, তাঁর অভিনয়েও প্রেয়সীর প্রকৃত হদিশ পাওয়া যায়নি। শিশিরকুমারের অভিনয় দেখে প্রথম উপলব্ধি করলাম চাণক্য চরিত্রের তত্ত্ব, যখন তিনি প্রেয়সীকে দেখিয়ে দিলেন চাণক্যেরই নিজের মস্তিষ্কে। মস্তিষ্কের নির্দেশেই চালিত হতেন চাণক্য, কারণ কন্যা অপহরণের পর তাঁর হৃদয় ভেঙ্গে গিয়েছিল। এই শুষ্কমস্তিষ্করূপিণী প্রেয়সীর দ্বারা চালিত হয়ে যে সাম্রাজ্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাতে তিনি প্রাণ সঞ্চার করতে পারেননি। চাণক্য আবার হৃদয়বান হয়ে উঠলেন কন্যাপ্রাপ্তির পরে, এবং তারই ফলে মৌর্যসাম্রাজ্যের হৃদয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

আসলে অভিনেতাই হল নাটকীয় চরিত্রের টীকাকার। অভিনয়কালে বাচনভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে এলেন টেরী লেডী ম্যাকবেথের একটি উক্তিতে পর পর তিন রাত্রিতে তিনরকম অর্থ প্রয়োগ করে দিলেন। স্যর হেনরী আইরিভিং অভিনয়ের মাধ্যমেই শেক্‌স্‌পীয়রের বিশিষ্ট টীকাকার হয়ে উঠেছিলেন—আইরিভিং সংস্করণ শেক্‌স্‌পীয়র গ্রন্থাবলী অভিনয়ভিত্তিক ব্যাখ্যাতেই সমৃদ্ধ।

যে সব পুরাণের চরিত্রে শিশিরকুমার পুনরাভিনয় করেছিলেন, তার মধ্যে নতুনত্ব এনেছিলেন তিনি এবং তার ফলে সেই চরিত্রগুলিকে নতুন করে দেখবার সুযোগ মিলেছিল। সাজাহান, যোগেশ ও রমেশ (প্রফুল্ল), চন্দ্রবাবু (চিরকুমার সভা), নিমচাঁদ (সধবার একাদশী) এই ধরণের নতুন ব্যাখ্যার বিশিষ্ট উদাহরণ। শিশিরকুমারের ব্যাখ্যা পূর্ববর্তী অভিনেতাদের চেয়ে

ভালো কি মন্দ তা নিয়ে মতভেদ হতে পারে, তবে তাঁর ব্যাখ্যা রসিক ও বিদগ্ধ মনকে চিন্তার খোরাক দিয়েছিল নিশ্চয়। স্বয়ং নাট্যকারের অনুমোদিত অভিনয়ই যে চরিত্রব্যাখ্যার শেষ কথা নয়, চাণক্য-ই তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এদেশে প্রকৃত পাণ্ডিত্য ও নব গবেষণার মূল্য আসলে, শিশিরকুমারের এবং অন্যান্য কৃতী অভিনেতাদের অভিনয়ের ভিত্তিতে নাটকের ব্যাখ্যা সংকলিত হত, বিশেষ যখন নাটক বি. এ. ক্লাসে বাঙলার একটি বিশিষ্ট পাঠ্য বিষয়।

শিশিরকুমারের কণ্ঠ, আবৃত্তিভঙ্গী, চোখমুখে ভাবের অভিব্যক্তি, পদক্ষেপ ও অঙ্গ চালনার অনবদ্য সামঞ্জস্য বুঝিয়ে বলবার নয়। তাঁর প্রয়োগকৌশল এবং তাঁর টোটাল এফেক্টও প্রত্যক্ষদর্শীর উপলব্ধির বিষয়মাত্র। কিন্তু বাঙলা রঙ্গশালার মরা গঙ্গায় যে বান ডাকিয়েছিলেন তারই জোরে বাঙলাদেশের নাটক ও অভিনয়ের ক্ষেত্র সরস হয়েছিল বহুকাল, আজও আছে।

আমাদের সেই উনিশ কুড়ি বছরের যুগে বাঙলার যুবক ও ছাত্র সমাজকে অভিভূত করে রেখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ নয় (অবশ্য আজকের রবীন্দ্রপ্রিয়তাও নাচ গান জলসা প্রিয়তার চেয়ে বেশি নয়, বিদ্রোহী কবি নজরুল, দ্বিতীয় 'বন্দেমাতরম্' মোহনবাগান—স্বাধীনতাকাঙ্খার এই দুই অভিব্যক্তির সঙ্গে ছিল শরৎচন্দ্রের হৃদয়বাদ। কিন্তু শুদ্ধ রস সৃষ্টির ব্যাপারে শিশির-কুমারের নাটক ও দিলীপকুমারের গান তখন তরুণ মনের প্রিয়তম উপাদান। আজকের তরুণেরা হয়তো ততটা ভাববহুল নয়, তবু বলবো তাদের মনের গাঙে আজকের নাটককে সে জোয়ার সৃষ্টি করতে দেখি না।

সে যুগের সব মনীষী মহাপুরুষ শিশিরকুমারের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ তাঁকে অন্তরে উচ্চসম্মানের আসন দিয়েছিল। তবু শেষ বয়সে শিশিরকুমার সবার উপর বিরাট অভিমান পোষণ করেই ধরা থেকে বিদায় নিলেন। এ অভিমান কার উপরে তা বিশ্লেষণ প্রচেষ্টা যে অপ্রাসঙ্গিক হবে না—শুধু তাই নয় বোধহয় আমাদের বর্তমান জীবনের গলদগুলি সম্যক উপলব্ধি করবার জন্য অপরিহার্য।

অভিনেতা মাত্রই বৃদ্ধবয়সে বাতিল হয়ে যান। দানীবাবুর অমন দরাজভাব সমৃদ্ধ কণ্ঠ-স্বর বৃদ্ধবয়সে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে উচ্চারণেও বিকৃতি এসে হাস্যকর অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। মুখের পেশী শ্লথ হয়ে গেলে তাতেও ভাব প্রকাশমূলক অভিব্যক্তির উপযুক্ত সঙ্কোচন ও প্রসারণ সম্ভব হয় না। শিশিরকুমারের বেলায়ও তাই হয়েছিল। দুঃখ তা নিয়ে নয়। দুঃখ হয় যখন দেখি তাঁর মত প্রয়োগশিল্পী ও অভিনয়শিল্পীর নাট্য কলার ধারায় হঠাৎ ছেদ পড়ে যায়, তাঁর সমগ্রজীবনের সাধনা উত্তরপুরুষরা অবজ্ঞা করতে থাকে।

হ্যাঁ অবজ্ঞাই করেছে এবং করছে।

ভারতে নাটক রচনা, অভিনয় ও প্রয়োগশিল্পের ঐতিহ্য অতি সুপ্রাচীন। এযুগে যখন বাঙলাদেশে নাট্যাভিনয় সুরু হল, তার প্রেরণা এসেছিল পাশ্চাত্যধারা থেকে। তবে গিরিশচন্দ্র প্রমুখ পথিকৃতের দল পাশ্চাত্যরীতির সঙ্গে দেশীয় গীতাভিনয় রীতির সামঞ্জস্য করেছিলেন। তারপর শিশিরকুমার যখন এলেন, তিনি গৈরিশীধারার মধ্যে সংস্কৃত এবং আধুনিকতার পাশ্চাত্যরীতির মিশ্রণ ঘটালেন, মেশালেন রবীন্দ্রনাট্যরীতি। কিন্তু বাঙলা নাট্যাভিনয়ের পূর্ব ঐতিহ্য গ্রহণ করেই তিনি পরিবর্তন প্রবর্তন করলেন। ফলে তাঁর কৃতি হয়ে উঠ্‌লো জাতীয় নাট্যশালা ও নাট্যরীতি বিকাশের এক বিরাট ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

হঠাৎ আমাদের মধ্যে চমকপ্রয়াসী কেউ কেউ বলে উঠ্‌লেন, গ্রীক নাটকের বা ইব্‌সেনী ছকে ঢালা না হলে তা নাটকই নয়। তাঁরা ঘোষণা করলেন, বাঙলা ভাষায় কোন নাটকই হয়নি, জনগণের বুদ্ধির দীনতা আর রুচিহীনতা ভাঙিয়ে খেয়েছেন পূর্ববর্তীর দল।

শুধু নাটক রচনায় নয়, দৃশ্যপটে এল নিউ-ইম্পেশানিজ্‌ম্, কিউবিজম ও সিম্বলিজম্; অভিনয়ে এল পাশ্চাত্য ম্যানারিজ্‌ম্। আর পাশ্চাত্যজীবনদর্শন-নির্ভর পাশ্চাত্য নাটকের ছায়ানুবাদ অভিনীত হতে লাগলো। তাঁদের প্রথম অভিযান সুরু হল জনজীবন থেকে বহুদূরে নিউ-এম্পায়ারে বা অনুরূপ মঞ্চে নমাসে ছমাসে অভিনয়ে। কিন্তু উন্নাসিক বুদ্ধিদম্ভী সমালোচক জনমনকে বিভ্রান্ত করে দিল এই সব অভিনয়ে প্রশংসাপ্রসঙ্গেই গৈরিশী-শিশিরী ধারাকে নস্যাৎ করে।

আনকোরা নতুন পদ্ধতি, যার সঙ্গে দেশের মাটির, দেশের ধারার, দেশের হৃদয়ের কোন সম্পর্ক নেই—তাই এসে জুড়ে বসলো বাজার, চমক ও চটকে সাধারণ লোকের চোখ ধাঁধিয়ে। তাছাড়া সাধারণ মানুষের মনের কোণে তখন লেগেছে গোপন কামনা, যেন সে সমঝদার বলে স্বীকৃতি পায়।

অনেকদিন আগেই শিশিরকুমার এই আগামীযুগের কালোছায়া উপলব্ধি করতে পেরে-ছিলেন। তাই ১৯৩৮ সালে স্টার রঙ্গমঞ্চে সরস্বতী পূজার সান্ধ্য উৎসবে একটি কিশোর যখন শিশিরকুমারের সামনে অটোগ্রাফের খাতাখানি ধরেছিল, তিনি লিখেছিলেন ঃ

কি কথা বলিব আর
কথা নাহি বলিবার
আছে শুধু অন্তরের গ্লানি,
আছে শুধু ভুল বোঝা
নিজ মনে ভুল খোঁজা.....

লিখে দিয়ে বালকটিকে বলেছিলেন, 'আমি মরে গেলে এটা ছাপিয়ে দিস'।

যে দেশবন্ধু ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর কদিনের মধ্যেই কর্পোরেশন তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রায় ত্রিশবছর সেকথা ভুলে বসেছিল। তারপর কোন মতে দায়মোচন হিসেবে তা কার্যকরী করেছে। প্রথম মেয়রের দেওয়া অনেক প্রতিশ্রুতির মতই তার জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিও তাই আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। আর পশ্চিম বাঙলা তথা ভারত সরকার তাঁরা সংস্কৃতিউন্নয়নকৃত্য যতই করুন না কেন, বর্তমান শাসকগোষ্ঠি দেশের বিদগ্ধমনের প্রতিনিধি নয় এ সত্য তো ব্যালট বাক্সের সাক্ষ্যে সুপ্রমাণিত। রবীন্দ্রনাথ 'আমার দোকানের ঘি খেতেন' এই দাবীতে যাঁরা রবীন্দ্রস্মৃতিসভায় পৌরোহিত্য করার অধিকার পায় তাদের নিমতলাঘাটে মাল্যদানেরই মতই আজ সংস্কৃতির প্রতি সরকার আর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির দরাজ হাত। সেখানে অজ্ঞতা ও ব্যুরোক্রেটিক দম্ভের দুই কড়া শাস্ত্রী পার হয়ে প্রকৃত শিল্পসাহিত্য-নাটক-সংস্কৃতি প্রবেশাধিকার পাবে এ আশা দুরাশা। বিশেষ যখন শিল্পী—সাহিত্যকেরাই রাষ্ট্রদণ্ডের কাছে নতজানু—"Just for a handful of silver" thus leave us—তখন জাতীয় সংস্কৃতির অপমৃত্যুর জন্য দুঃখ জানাবো কার কাছে। শিশিরকুমারের মত শিল্পীরা ব্যর্থতা নিয়েই বিদায় নেবেন। রবীন্দ্রনাথের কীর্তি ছাপার অক্ষরে স্থায়ী, সারা দুনিয়ায় তার কদর ও পসার নইলে তাকে নিঃশেষ করতেও আমরা পিছপা হতাম না। তবু আজ স্মৃতির রোমন্থন করতে বসে মনে হচ্ছে— to be young (then) was very heaven.

উত্তরবঙ্গের লোকগীতি

ভবানীগোপাল সান্যাল

তিব্বতীয় চৈনিক ভাষাভাষী মোঙ্গলগণ পশ্চিম চীন থেকে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে খৃষ্ট-পূর্ব যুগ থেকে ব্যাপ্ত হতে আরম্ভ করে। পূর্বোক্ত ভাষা গোষ্ঠীর দুটি শাখা উল্লেখযোগ্য। (১) তিব্বতীয়-বর্মী (২) শ্যাম-চৈনিক। তিব্বতীয়-বর্মীর অনেকগুলি শাখা-প্রশাখা। (ক) তিব্বতীয় (খ) হিমালয় অঞ্চলের ভাষা যথা, নেওয়ারী, মগর, কিরাতি, লেপ্‌চা (গ) হিমালয়ের উপভাষা, যেখানে ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের সমন্বয় চোখে পড়ে, ধীমাল, লেম্বু, অম্বু প্রভৃতি (ঘ) উত্তর আসামী, যথা, ডাফ্‌লা, মিস্‌মী, মিরি— আবর (ঙ) আসাম-বর্মী। এই আসাম-বর্মী শাখার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বোভো (রাজবংশী উপভাষা এখান থেকে সম্ভূত), মেচ, গারো ও কাছারী। তা ছাড়াও আছে মণিপুর ও ত্রিপুরার ভাষা, নাগাদের ভাষা যথা, আও, সেবা, অঙ্গমী প্রভৃতি।

সাধারণ ভাবে তিব্বতীয় বর্মী শাখার অন্তর্ভুক্ত ভাষা কিরাত নামে অভিহিত। কিরাত শব্দের অর্থ যারা প্রত্যন্ত দেশে বাস করে। পূর্ব নেপালে তিব্বতীয়—বর্মী শাখার অধিবাসীরা বাস করত। তাদের নাম অনুযায়ী কিরাত শব্দের সৃষ্টি সম্ভব। বাংলা ভাষায় এই শব্দটি অপ্রচলিত নয়।[১] কিরাত বা কিরেত শব্দের অর্থ কৃপণ ও এর সম্পৃক্ত শব্দ চিরতা, চিরেতা। কিরাতগণ বাস করতো হিমালয়ের সানুদেশে। মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে যে ভীম সাতজন কিরাত নৃপতিকে ইন্দ্র-পর্বতে এসে পরাজিত করেন। কিরাত শব্দের পৌরাণিক মহিমাও বিস্মরণ যোগ্য নয়। স্বয়ং মহাদেব কিরাত বেশে একদা অর্জুনকে পরীক্ষা করেন। কিরাত জাতির দেবতা মহাদেব-পার্বতী।

বোভো শাখার অধিবাসীরা প্রথমতঃ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় পরে সমস্ত উত্তর বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। তিব্বতীয়-বর্মী শাখার মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে।[২] অবশ্য সকল শাখার মধ্যে বর্তমানে এইগুলি চোখে পড়েনা, সম্ভবতঃ আর্য্য সভ্যতার প্রভাবে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে লক্ষণীয় (ক) বাঁশ বা কাষ্ঠ নির্মিত উচ্চ গৃহে বাস (খ) বিবাহের পূর্বে পরীক্ষা-মূলক ভাবে নারী-পুরুষের একত্রে বাস (গ) দুগ্ধের প্রতি অপ্রীতি (ঘ) অবিবাহিত ব্যক্তিগণের একসঙ্গে বাস (ঙ) মৃত ব্যক্তিদের উচ্চস্থানে প্রোথিত করা।

জলপাইগুড়ি অঞ্চলে যে টোটো জাতি বাস করে তাদের দুগ্ধ-অপ্রীতি আছে।[৩] গারো ও কাছারীরা দুধ পছন্দ করেনা। বর্তমানে অবশ্য তারা দুধের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। টোটোদেরও সঙ্গে পানি কোচ রাজবংশীদের সাদৃশ্য দেখা যায়। টোটোরা বাস করে মাটি থেকে উঁচু ছ'ফুট উচ্চ-ঘরে। তারা বালিশ, বিছানা বা মশারি ব্যবহার করেনা। মেচ, ভুটিয়া ও রাজবংশীগণ বর্তমানে বালিশ বা সিতান ব্যবহার করে থাকেন। পরীক্ষা-মূলক বিবাহ পদ্ধতি টোটোদেরও মধ্যে প্রচলিত আছে। পরে কন্যা গর্ভবতী হলে আনুষ্ঠানিক বিবাহ সম্পন্ন হয়।

পূর্ণিয়া জিলার রাজবংশীদের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত ছিল। দরিদ্রদের মধ্যে এই আনুষ্ঠানিক বিবাহের নাম পানি-ছিটা।[৪] বর্তমানে এই নীতি অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছে।

---

১ ও ২ : কিরাত জন কৃতি : ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৩ : টোটো জাতি : ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল

৪। কাস্টস এন্ড ট্রাইবস্ অফবেঙ্গাল : মিত্র : পৃ ২৭৫

রাজবংশীগণ নিজেদের ক্ষত্রিয় পরিচয় দান করেন। আনুমানিক খৃষ্টীয় একাদশ শতকে বগুড়া জিলার মহাস্থান গড়ে ভোজগোড়ের বংশধর নরসিংহ বা পরশুরাম রাজত্ব করতেন। পৌন্ড্রবর্ধন ও তাঁর পুত্রগণ পরশুরামের ভয়ে রত্নপীঠ বা পশ্চিম কামরূপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ক্ষত্রিয়চিহ্ন যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করবার ফলে সঙ্কোচ বা ভয় হেতু তাঁদের নাম হয় কোঁচ, কোচ। অপর এক শাখা চন্দ্রবংশীয় স্বাদশ ক্ষত্রিয় কুমার রত্নপীঠে মেচ পরিচয় গ্রহণ করেন।[৫] কামতাপুর বা কামতেশ্বরের রাজগণ প্রকৃত পক্ষে ক্ষত্রিয় কারণ তাঁরা পৌন্ড্রবর্ধন রাজ বর্দ্ধনের বংশধর। প্রথমত পৌন্ড্রবর্ধন-রাজ যে ক্ষত্রিয় তা প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, ভাষার দিক থেকে এই ক্ষত্রিয় রাজবংশীগণ যে আসাম-বর্মী শাখায় অন্তর্ভুক্ত সে-সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।

রাজবংশীগণের সঙ্কোচ ও সঙ্কুচিত অবস্থা থেকে কোচ, কোঁচ শব্দ এসেছে বলে অনুমান করা হয়। সঙ্কোশ নদীর ধারে এঁরা বাস করতেন বলে নদী নাম পরিবর্তিত হয়ে জাতি নাম গঠন করে থাকতে পারে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে কোচ রাজশক্তি পাল রাজশক্তিকে পরাভূত করে উত্তর বাংলায় আধিপত্য বিস্তার করে। কম্বোজ বংশের গৌড়রাজ ৯৬৬ খৃষ্টাব্দে শিব মন্দির নির্মাণ করেন। বাণগর শিলালেখে এর উল্লেখ আছে। পূর্বোক্ত কম্বোজ শব্দ থেকে এসেছে কমোচ, তা থেকে কঁওচ ও পরে কোঁচ, কোচ। এই কম্বোজ শাখার সঙ্গে ইতিহাসে বিশ্রুত কম্বোজ বংশের কোন সম্পর্ক নাই।[৬]

পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে কোচদের কু-বাচক রূপে অভিহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে এদের ভাষা পৈশাচিকী, লোকাচার নেই, সর্বভক্ষারতা ও গো-ব্রাহ্মণ হত্যাকারী। এই জাতীয় পুরাণ সমূহের রচনা কাল দশম শতাব্দীর পূর্বে নহে[৭] ও এর পূর্বেই বোভো জাতি আর্য্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবাধীন হয়েছিলেন বলে মনে হয়।

কোচ বা রাজবংশী জাতির প্রতিষ্ঠিত রাজত্বের উদ্ভব ঘটে কোচবিহার রাজ্যে। এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দের পরে বিশ্বসিংহ।[৮] বৈদিক রীতি অনুযায়ী তাঁর অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তিনি হিন্দু ধর্মের সমর্থক ছিলেন ও কামাখ্যা মন্দির সংস্কার করেন। কিন্তু কোচবিহার বা বিহার রাজ্য[১] প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে কামতাপুরে (কোচবিহারের সন্নিকটে) খেন[২] শাখা রাজা নীলধ্বজ প্রতিষ্ঠা করেন। এঁর রাজত্ব ছিল ধরলা নদীর

৫। কোচবিহারের ইতিহাস : চৌধুরী আমানতুল্লা। মেচ শব্দ ম্লেচ্ছ শব্দের অপভ্রংশ। সুতরাং এ শব্দটিও আর্য্য ক্ষত্রিয়ত্বের প্রতিবাদ করে।

৬। কিরাত-জন-কৃতি : ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ৬১

৭। দি স্ট্রাগল ফর এম্পায়ার : ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার পৃঃ ৩৭৯

৮। চৌধুরী আমানতুল্লার মতে বিশ্বসিংহ সিংহাসনে বসেন ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে।

১ দীর্ঘকাল পর্যন্ত কোচবিহার বিহার-রাজ্য বলে পরিচিত ছিল। মহারাণী বৃন্দেশ্বরী আই (দেবী) কর্তৃক লিখিত 'তেহারোদন্ত' বা কোচবিহার-কাহিনীতেও (মুদ্রিত ১২৬৬ সন) কোচবিহারের নাম দেওয়া হয়েছে তেহার। পরে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ঘোষণা পত্রে কোচবিহার রাজ সরকার "কোচবিহার নাম লিখিতব্য" বলে ঘোষণা করেন।

২ ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই খেন বংশকে কোচবংশের শাখা বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু মনে হয় এই খেন বংশ কুকি বা চীন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য যখন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এঁরা আর্য্য সভ্যতায় প্রভাবাধীন হয়েছিলেন।

তীরে ১৯ মাইল পরিধি নিয়ে।[২] নীল ধ্বজের পরে চক্রধ্বজ ও তৎপরে নীলাম্বর রাজা হন ও হুসেন সাহ কর্তৃক বিজিত হন। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে এই পরাজয় ঘটে। নীলাম্বর গোসানী মঙ্গল কাব্যে রাজা কান্তেস্বর বলে অভিহিত। গোসানী মঙ্গল রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী কর্তৃক মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে বিরচিত। কাব্যটি রাজবংশীগণ শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন। এই গ্রন্থে কামতাপুরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বেহারে শ্রীবৎস রাজার পরে মহাভারত-প্রসিদ্ধ ভগদত্ত রাজা হন। সেই বংশ বিলুপ্ত হলে জামবাড়ী অঞ্চলের দরিদ্র বালক দেবী কান্তেস্বরী বা কামদেস্বরীর কৃপায় (কামাখ্যা দেবীর অপর নাম কামদা) রাজা হন। স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পেয়ে কাজিলী কুড়ায় সর্পপুচ্ছ ধারণ করায় তাঁর রাজত্ব এক পুরুষে শেষ হয়। ভগদত্তের বাহুতে সহজাত-কবচ মাটির নীচে প্রোথিত ছিল। রাজা কান্তেস্বর তা উদ্ধার করে কবচরূপিনী দেবীকে অর্থাৎ গোমানী-দেবীকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। পড়ে মুসলমান আক্রমণের সময়ে দেবীকে তাঁর আদেশে কাজিলী—কুড়ায় বিসর্জন দেওয়া হয়। পরবর্তী কালে মহারাজ প্রাণ-নারায়ণ ১৫৮৭ শকে গোমাণী মাড়িতে (কামতাপুরে) মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেবীকে পুন-প্রতিষ্ঠিত করেন। উক্ত কবচ একটি রৌপ্যাধারে আবদ্ধ ও তার উপরে ভগবতী মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।

গোসাণী মঙ্গল অনুযায়ী কান্তেস্বর (ইতিহাস বর্ণিত নীলাম্বর) ক্ষত্রিয় ছিলেন কারণ তিনি মাতার মৃত্যুর পরে ঃ আমকাষ্ঠ আনি রাজা শবদাহ করে।
পিণ্ড দান করিলেক ক্ষত্র ব্যবহারে ।।

গোমাণী মঙ্গলের ভাষা অর্বাচীন, কাহিনী বিদ্যাসুন্দর প্রভাবান্বিত। মাঝে মাঝে দু' একটি প্রাচীন শব্দ মাত্র আছে ঃ মস্তকে ভরণ দিয়া বাতি বসাইল।

ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরে লতা-পাতা বেঁটে ঔষধের সঙ্গে প্রলেপ দিলে তাকে বলে ভরণ ও অপদেবতার পূজাকে বলে পাতি। কতকগুলি বিশিষ্ট রাজবংশী শব্দ পাওয়া যায়, যথা হুমা-হুমি (মায়ে পোয়ে গলাগলি কান্দে হুমাহুমি), পেটেলা (সড়োবড়ে জলক্রীড়া), ভেরু (জল)।

দু এক স্থানে অত্যন্ত আধুনিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।
কামানে পুড়িয়া গোলা ফায়ার করিল।

রাজবংশীগণ তাঁদের ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চান। এই দাবী বিহারের লিচ্ছবিগণও করে থাকেন। কিন্তু তাঁদের মোঙ্গল পরিচয় বিস্মৃত হবার নয়। ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীতে একটি কথা মেনে নিতে হয় যে সভ্যতা ও সামরিক সংঘটনের ক্ষেত্রে তাঁরা যথেষ্ট উন্নত ছিলেন ও তাঁরা কোনক্রমেই অসভ্য ছিলেন না।

রাজ বিশ্বসিংহ কামতেশ্বর উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। তাঁর পুত্র নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজ (= চিলা রায়) এই ধারায় শ্রেষ্ঠ নরপতি। নরনারায়ণের রাজত্বকালে ইংরেজ পর্যটক রালফ্ ফিচ্ রাজ্য পরিদর্শন করেন ও রাজত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। নরনারায়ণ ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আবার অন্যদিকে কাছারী বা মেচেদের ধর্মানুষ্ঠানেরও যথেষ্ট সুযোগ দেন। শুক্লধ্বজ বা চিলা রায় ছিলেন একজন উৎকৃষ্ট সেনাপতি।

ঘোড়ে চরি চিলা যেন বাস্কে রণ মাঝে।
এতেকে সে চিলা রাই বোলে সব রাজো ।।

৩ কামাতাপুরের বিরাট গড় এখন নানাস্থানে ভগ্ন। রাজপাটে মৃত্তিকা-স্তূপ ও বারোটি প্রস্তর-মূর্ত্তি ছাড়া আর কিছু নাই। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাগিণী মূর্ত্তি।

শুক্লধ্বজ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, শৌর্য্যবীর্য্য, নিঃস্বার্থপরতা ও অবিচলিত ভ্রাতৃপ্রেমের জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। কোচবিহার রাজবংশ অমিত তেজে ও অম্লান দীপ্তিতে ভারতের স্বাধীনতা কাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেছেন। বাংলা দেশের ইতিহাসে তাঁদের দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। সুদীর্ঘ-কাল ধরে এই রাজ্যে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় চর্চা হয়েছে।

রাজবংশী ভাষা ধ্বনি-সম্পদে ও অর্থ-ব্যঞ্জনায় অত্যন্ত সুন্দর। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই ভাষা আজ দ্রুত বিলীয়মান। এই ভাষা ভাষীরা বর্তমানে বাংলা-ভাষা গ্রহণ করেছেন।। তাই, পুরাতন ভাষা আজ অবলুপ্তির পথে। তথাপি, বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করবার জন্য এই ভাষায় আলোচনার সার্থকতা আছে। অতীত অবগাহন নিরর্থক হবেনা।

রাজবংশী ভাষায় নামকরণের বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যে ব্যক্তি দুপুরে জন্মেছে তার নামকরণ হয় দুপুরু, সন্ধ্যায় সান্ঝু, রাত্রে আন্ধারু, জ্যোৎস্না-রাত্রিতে জোনাকু, প্রত্যুষে পোহাতু, স্ত্রীলোক হলে নাম হয় পোহাতী।

রাজবংশীগণের লোকগীতির সম্পদ অসাধারণ। অবশ্য এ-কালে অনেকে ইতঃস্ততঃ গানগুলি সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলি আধুনিক ভাবে ও ভাষায় রূপান্ত-রিত হয়েছে।

নিজের আলিসে হাত পড়ে বালিসে চ্যাতন হইয়া ফ্যালো বন্ধু নাই বগলেতে
মনে করো বন্ধু বুঝি আসে। প্রাণ মোর স্যাঙ্গস্যাঙ্গা হইচে ।।

কিংবা

আরে ওরে প্রাণের কন্যা
না করি আর বৈদেশা পীড়িতি।
তোমার সাথে পীড়িত করি
কান্দেতে হবে জনম ভরি রাত পোহাইলে যাও নিজ দেশে ।।[১]

এইগুলি পড়লে বুঝতে পারা যায় যে আধুনিক কালের কোন লোক-কবি পুরাতন কাব্যের ভাব, বৈষ্ণব কবিতা বা মৈমনসিংহ গীতিকা, গ্রহণ করে রাজবংশী ভাষাকে আধুনিকতায় সজ্জিত করেছেন। এখানে রাজবংশী ভাষায় ক্রিয়াপদ ও বিভক্তি প্রয়োগ সঠিক নয়।

(ক) রাজবংশীদের মধ্যে রীতি আছে যে সন্তান-প্রসব কালে দেরী হলে তাঁরা ভূত-কালীর পূজো করেন। এর ফলে গর্ভিনী মাতা নিরাপদে সন্তান প্রসব করেন।

ধুয়া (দোহার) ও গে, বিষের চোটে, বিষের চোটে
উপজিল্ কালী গে, বিষের চোটে।

পয়ার দশমাস দশদিন দিবসে পুরিল্
হারিয়া[২] ভিতি দেওয়া[৩] গির জিল্[৪]।
আশমান ভাঙিয়া নারীর মাথা পড়িল্
পরথমে ছুটি গেইল্ অন্তের[৫] হাল্ ।।
পৈসাঞ্জের বেলায় ফেণী দিল্ দেখা।
(খ) ঘুমপাড়ানী ছড়া
(১) আয় নিন্ ৬ আয় চখুত্ ভাস[৭] বান্ দে

১) মঞ্জীর ঃ সম্বকলন ঃ সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২) হারিয়া কোন—উত্তর পশ্চিম কোন। ৩) দেওয়া = দেবতা অর্থাৎ মেঘ ৪) গিরজিল্ = গর্জন করিল ৫) অন্ত = রক্ত ৬) নিন্ = নিদ্রা ৭)

কোটেকার য়াবাতের নিন্ চখুত্ ভাসা বান্ দে।
হাটের নিন্ পথের নিন্ চখুত্ ভাসা বান্ দে।
(৶০) হামার মাই নাচে
আদোন ৯ ধান পাশে
মাথায় চুলি ঝাপুর ঝাপুর বুড়া ভাতার পাচে ১০।
(৶০) চপ্‌তে চুপ্ হো কোশ ১১ ছোয়া ১২
তোর বাপ গেইসে সোর ১৩ মারিবা
সোর মারিতে পাইসে টাকা
কিনিয়া আনিতে মালদই যত ১৪।

দুষ্ট ছেলেমেয়েদের ভয় দেখানর রীতি সর্বদেশে আছে। এর দৃষ্টান্ত রাজবংশী গানেও লক্ষ্য করা যায়।

চিলায় নিগাক্ ১৫ হো কোশে নিগাক্ বস্ত করে
আনে দেউক।
আয় রে চান্ টিকিত্ পর
হামার বাউ বস্ত কর।

গ) রাজবংশীগণের মধ্যে খিচর বা খিতোর গান প্রসিদ্ধ। এখানে ঠাকুর্দা ও নাতনীর মধ্যে যে রহস্যালাপ চলে, তা অবলম্বন করে এই গানগুলি রচিত হয়। ঠাকুর্দা নাতনীকে সম্বোধন করে বলছেন :

ও গি গে নাতিন্
গাভুর কালে
দেহের সভাব
যেন কান্‌চা সোনা
উথ্‌লে পেমের ঢেউ
বানত্ মানেনা।

ও গে বস্‌সা কালে
বিলে খালে
কেমন জলের ফেপেনা।
ও গে দিন চিয়ালে
জল শুকালে
মাটি শুকুনা।

ঘ) রাজবংশীগণের মধ্যে প্রেম-সঙ্গীত অত্যন্ত সমৃদ্ধ। মৈষাল বন্ধু মহিষ নিয়ে মাঠে যায়। তাকে কেন্দ্র করে তার প্রেমিকা গান রচনা করে। সুরে সুরে সেই গান এক অপূর্ব ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। দোতরার সহযোগে এই গানগুলি বড় চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। কিন্তু মুস্কিল এই যে গানগুলির ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আধুনিক হয়ে পড়েছে।

আমার বাড়ী যাইও রে মৈষাল, বসতে দিব পীড়া,
জলপানও করিতে দিব শাইল ধানের চিড়া;
শাইল ধানের চিড়া দিব, বর্শি ধানের খই
বাড়ীর গাছের কারী কলা, গামছা বাঁধা দই।

এই প্রেম-সঙ্গীতের মধ্যে এসে পড়েছে রাধা কৃষ্ণ গীতি। এই গীতি মইষাল বন্ধুর পরিপূরক গান।

ভাসা = বাসা। মহাপ্রাণ বর্ণের প্রয়োগ এখানে লক্ষণীয়। ৮) চখুত্ = চোখেতে।। অধিকরণ কারকে —ত— বিভক্তির প্রয়োগ। ৯) দোল=১২ সের। আ দোন = ৬ সের ১০) পাচে=পাছে অর্থাৎ পেয়েছে।

১১ হো কোশ = দুষ্টু ১২ ছোয়া = ছেলে (শাবক ১৩ সের = শূকর। অভিশ্রুতির প্রয়োগ এখানে লক্ষণীয় ১৪ ফতা = সিল্কের কাপড়। ১৫ নিগাক = লইয়া যাউক্। সংযুক্ত ক্রিয়াপদের একীকরণের দৃষ্টান্ত।

তোক্ সে বলোঁ ছাওয়াল কানাই, তোর সে ভাঙ্গা নাও;
ভাঙ্গা নাওয়ের খেওয়া দিয়ারে। কেমন মজা পাও (রে)। শ্রীকৃষ্ণের উক্তি :
এক সুন্দরীক পার করিছোঁ, নিছোঁ আনা আনা
তোক্ সুন্দরীর পার করিতে নে, ও তোর খসাইম
কানের সোনা রে।
জল ছেঁকিতে জল ছেঁকিতে রে সেঁউতির ছিঁড়িল দড়ি,
গলার হার খসেয়া কন্যা রে নাগাইম সেঁউতির দড়ি রে।

ঙ) রাজবংশীগণের মধ্যে একদা নাগাজাতীয় বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল। ফুল বিহা, পানি ছিট বিহা, ঘর সেঁধানী বিহা, গাও গছ পর খেতরি পাশুয়া, ঘোরাজিয়া বিহা, কইনা পাত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে বিবাহ হয় আর্য্য পদ্ধতিতে; অন্যান্য বিবাহ-প্রথা আজ লুপ্ত। কইনা পাত্র বিবাহের কথা কোচবিহারের মহারাজা শিতেন্দ্র নারায়ণের মহিষী মহারাণী বৃন্দেশ্বরী দেবী আই তাঁর তেহারোদন্ত বা কোচবিহারের ইতিহাসে উল্লেখ করে গিয়েছেন। এই গ্রন্থ ১২৬৬ সালে মুদ্রিত হয়। রাণী বৃন্দেশ্বরীকে মহারাজা শিতেন্দ্র নারায়ণের যেদিন বিবাহ করেন, সেদিন তিনি জলপাইগুড়ির অন্তর্গত ময়নাগুড়ির অন্তর্গত চাপগড়ের ভূস্বামী বজ্র ধর কার্য্যীর কন্যা কামেশ্বরী দেবীকেও বিবাহ করেন। কামেশ্বরী দেবী হলেন ভাঙ্গার আই ও বৃন্দেশ্বরী দেবী বড় আই।

কামেশ্বরী দেবীর বিবাহ-প্রসঙ্গে বৃন্দেশ্বরী দেবী লিখেছেন :

চাপাগড় গ্রামে ধাম তাহে বজ্রধর নাম ভূপাগজ আনি তাঁরে রাখিলেন সমাদরে
সর্ব্ব গুণান্বিত সুপণ্ডিত। উদ্বাহ সমাধা নাহি করি ।।
ইষ্ট নিষ্ট মিষ্ট ভাষী কোন দোষে নহে দোষী রাজার তনয় যত সবকার এই মত
ধনরত্ন যশেতে পূর্ণিত ।। পাত্রী আনি ঘড়েতে রাখিল
তাঁহার কুমারী হন ব্যক্ত আছে ত্রিভুবন, পূর্ব রীতি অনুসারে কেহ নাহি বিয়া করে,
যাঁর নাম শ্রীশ্রী কামেশ্বরী। শ্রীশ্রী বৃন্দেশ্বরী নিবেদিল ।।[১]

এই বিবরণ থেকে কইনা পাত্রের রীতি বুঝতে পারা যায়। মনোনীতা কন্যাকে গৃহে রেখে পরে তাঁকে বিবাহ করা হতো।

শিবের বিয়াও অর্থাৎ বিবাহের কথা গানের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে।

শিবের আজ বিয়াও ভাইরে অগেয়া[১] যাইরে কৈলাসপুরী বুলি[২]।
শিবের গায়র ভস্মগুলা ঝলঝলেয়া[৩] জ্বলিয়া উঠিল্ খালি ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু সদায় জয় শিব গায় সূয্যা ধরিল্ ছাতি।
গদা চমর চুলায় বম্ ভোলা কয়্ তারার হাতোৎ বাতি।
ভূত প্রেত প্যাত্তানী[৪] শিবের বরযাত্রীগুলা।
সগাঁয়[৫] আসি গিস্যি সোঁদাইল[৬] কানু ভেদুর নুলা ॥

---

১ তেহারোদন্ত —পৃঃ ১১

১। অগ্রে ২। দিকে ৩। ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ ৪। প্রেতিনী ৫। সকলে ৬। প্রবেশ করিল।

রাজবংশীদের জন্যে বিবাহের মন্ত্র নিম্নরূপ।

সগ্‌গ হাতে নামে হর গৌরী
মত্‌তে দিয়া পাঁও।
সত্য ছাড়ি মিথ্যাও হবো
দোহাই শিবের মাথা খাবো

উপের ৭ সগ্গে মিলন হলো
উপেরে উপেরে নাগরি
দুই ঝনে ৮ মিলন হলো
কেশর কেশরী।

ধর্মসঙ্গীত রাজবংশীদের মধ্যে অনেক আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি বিশুদ্ধ ধর্মসঙ্গীত আর কতকগুলি প্রকৃতপক্ষে ঋতু সঙ্গীত। আবার কতকগুলি আছে যা সুবিদিত কাহিনীর মাধ্যমে ধর্মতত্ত্ব প্রচার করা হয়। বিষহরি, গম্ভীরা বা শিবগীতি ধর্মগীতি; গোরক্ষনাথ ও সোনারায় রূপারায়ের গান মূলতঃ কাহিনীমূলক এবং মদনকামের গান ঋতু—উৎসবের গান ও এর মধ্য নিয়ে নর-নারীর মিলনাকাঙ্খা প্রকাশ করা হয়। এরই প্রকার ভেদ আসামে, যার নাম বিহু-উৎসব।

ছদমা গান নামে আর এক প্রকারের গান উত্তর বঙ্গে রাজবংশীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। আষাঢ় মাসে যখন প্রবল খরা, বর্ষণ নেমে আসেনা, তখন গৃহের বধূরা রাত্রে একজন মাদল বাদ্যকরের সঙ্গে মাঠে যেয়ে সম্পূর্ণ উলগ্ন হয়ে নৃত্য করে। এর ফলে আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামে। এই রীতি কেবল রাজবংশীদের মধ্যে নয়, উত্তর ভারতে অনেক জায়গায় প্রচলিত আছে।

দেওয়া তুই বরষেক্ রে।
গাও ভুইআ মুই
বারি লাগি যাঁও ৯।
হারিয়া কোনেতে
যেমন দেওয়া ১০ দুদুরায়
ওই মতন চেরী গিলা
ফেরফেটায়।

আষাঢ় মাস শান ১১ মাস
দেওয়াত্ ন হয় পানি।
তিনদিন কার সরার ১
গায়ত্ পইছে ছানি।
দেওয়া তুই বরষেক রে
গাও ধুইআ মুই
বারি লাগি যাঁও।

এই গানগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিরাআ গান বা হাতীকে পোষ মানাবার গান। এর আরো একটা পরিচয় আছে। এর মধ্যে বারো মাসের পরিচয় আছে।

বৈশাখ মাসতে বনের যত পাখি
সকলি নেয় ভাসা ৩।
জেঠনা মাসতে জেঠুয়া রামের ৬ কলি
ছলাসিল্ অভাগীর মন

শুনিয়া পিয়ার বুলি।।
আষাঢ় মাসতে কালুয়া মাঘ ৭ ঝরে
সরু সুতার কাপর চিরে
দুই যৌবনের ভারে॥ * ইত্যাদি

৭। রূপে ৮। জনে। অল্পপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণ রূপে প্রয়োগ। ৯। বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাব ১০। দেবতা বা মেঘ ১১। শ্রাবণ।

৫। বাসা ৬। আম ৭। কালো মেঘ।

* এই প্রবন্ধের অধিকাংশ গান জলপাইগুড়ির ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যালের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

নাট্যশালার অবিস্মরণীয় পুরুষ

গোপাল ভৌমিক

'দেহপট সনে নট সকলই হারায়'—এই নির্মম সত্য অস্বীকার না করে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর ক্ষেত্রে এই সত্যোক্তিও মিথ্যা প্রমাণিত হবে। তার কারণ শিশিরকুমার নিছক দর্শক মনোরঞ্জনকারী নট মাত্র ছিলেন না। বিগত ৪০ বৎসর ধরে শুধু বাংলা রঙ্গমঞ্চে নয়, ভারতীয় রঙ্গমঞ্চেও তিনি ছিলেন নটশ্রেষ্ঠ। মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে এই শ্রেষ্ঠত্বের আসন থেকে কেউ হঠাতে পারেনি এবং অদূর ভবিষ্যতে তাঁর মত প্রতিভাধর কোন নট বাংলা রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হবেন কিনা তাও সন্দেহের বিষয়। কিন্তু শিশির-প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব যদি এই নাট্যাভিনয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে তাঁকে ভুলে যাওয়া দেশবাসীদের পক্ষে সহজ হত। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে ঘটনাচক্রে তাঁকে 'শ্রী রঙ্গম' রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে অবসর জীবন যাপন করতে হয়েছিল। এই বাধ্যতামূলক অবসরকালে কলিকাতার পেশাদার রঙ্গমঞ্চে তাঁর দেখা না পাওয়া গেলেও তিনি জীবিকার প্রয়োজনে দল গঠন করে নিজের অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়ে বেড়াচ্ছিলেন বাংলার মফস্বল শহরগুলিতে। যদি নট হিসাবেই শিশিরকুমারের একমাত্র পরিচিতি হত, তাহলে, কলিকাতার রঙ্গজগৎ থেকে তাঁর এ সাময়িক বিদায় গ্রহণই তাঁকে ভুলে যাবার পক্ষে যথেষ্ট হত। কিন্তু দেশবাসী যে তাঁকে ভুলতে পারেনি তার প্রমাণ নতুন করে পাওয়া গেছে পরিণত বয়সে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে। সারা দেশ তাঁর মৃত্যুতে যেভাবে শোকোদ্বেল হয়ে উঠেছে তাতে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে বাঙ্গালীর চিত্তলোকে শিশিরকুমারের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা আছে—দেহপটের সঙ্গে সঙ্গে তা মিলিয়ে যাবার নয়।

সংস্কৃতিপ্রাণ বাঙ্গালীর অন্তরে শিশিরকুমারের স্থায়ী প্রতিষ্ঠার কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে দেখা যাবে যে সংস্কৃতিবান রুচিশীল বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের কাছে শিশিরকুমার মাত্র নটশ্রেষ্ঠ ছিলেন না, তিনি ছিলেন রঙ্গমঞ্চেরই সমার্থবোধক। শিশিরকুমার শুধু ব্যক্তিবিশেষ ছিলেন না, তিনি নিজের জীবিতকালেই একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এর ফলে শিশিরকুমার ও বাংলা রঙ্গমঞ্চকে ভিন্ন করে দেখবার উপায় ছিল না। আমাদের রঙ্গমঞ্চের কথা ভাবতে গেলেই আমরা সর্বপ্রথম স্মরণ করি শিশিরকুমারের কথা এবং তাঁর কথা মনে পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের কথা আমাদের মনে আসে। বাংলা রঙ্গমঞ্চে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ছাড়া এরূপ সম্মানের দাবী আর কেউ কোনদিক দিয়েই করতে পারেন না। বাংলা রঙ্গমঞ্চই শিশিরকুমারের প্রাণ ছিল এবং তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধানের জন্যেই তিনি জীবনের সকল শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন। বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যাভিনয়ে শিশিরকুমার তাই সর্বাধিক স্মরণীয় পুরুষ। ১৯২০-২১ সালে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের প্রথম আবির্ভাবের পর থেকে গত ৪০ বৎসর কাল বাংলা রঙ্গমঞ্চে যে যুগ চলেছে তাকে নির্বিবাদে শিশির-যুগ বলে চিহ্নিত করা যায়। তাঁর সমসাময়িক কালে ও তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা রঙ্গমঞ্চে বহু শক্তিমান অভিনেতার সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি। কিন্তু তাঁদের কেউ নিজেদের শক্তির ছাপ এভাবে রঙ্গমঞ্চের সর্বাঙ্গে এঁকে দিতে পারেন নি। এইখানেই শিশির-প্রতিভার বৈশিষ্ট। সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর পূর্বে বাংলার ধ্বংসোন্মুখ নাট্যশালায় নিজের অপূর্ব প্রয়োগ নৈপুণ্য ও অভিনয় কলার সাহায্যে তিনি যে প্রাণবন্যার সঞ্চার করেছিলেন তার পলিমাটিই আমাদের রঙ্গমঞ্চের যা-কিছু

সমুশ্বির জন্যে দায়ী। এখনও আমাদের রঙ্গমঞ্চ শিশির-প্রতিভার আলোকেই পরিস্নাত। তাই শিশিরকুমারের দেহাবসান হলেও বাংলা নাট্যশালা থেকে শিশির-যুগের অবসান হয়নি। বাংলা রঙ্গমঞ্চে যে পর্যন্ত আবার তাঁর মত প্রতিভাধর প্রয়োগশিল্পী এবং সৃষ্টিশীল অভিনয়শিল্পীর আবির্ভাব না হয়, সে পর্যন্ত আমাদের শিশির-যুগের রকমফের নিয়েই খুসি থাকতে হবে।

প্রতিভাধর ব্যক্তি যখন শিল্প, সাহিত্য বা রাজনীতিতে আবির্ভূত হন, তখন আলোড়নের সৃষ্টি হওয়া প্রায় অবধারিত ব্যাপার। অধ্যাপনা ছেড়ে শিশিরকুমার যখন পেশাদার রঙ্গমঞ্চে যোগদান করেছিলেন তখন বাংলার সংস্কৃতি জগতে অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর যতদিন তিনি পেশাদার মঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ততদিন তিনি তাঁর নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি যখন যে থিয়েটারে যে নাটকই মঞ্চস্থ করেছেন তখন সে নাটকই হয়ে উঠেছে সংস্কৃতিপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের আলোচনার বস্তু। হয়তো সস্তা জনপ্রিয়তা তাঁর সকল নাটকের ভাগ্যে জোটে নি কিন্তু তাঁর প্রযোজিত-পরিচালিত প্রতিটি নাটকেই তিনি দেশবাসীদের কিছু না কিছু নতুন জিনিস দেবার চেষ্টা করেছেন। প্রতিভার অন্যতম ধর্ম যে নিত্য নতুন সৃষ্টিশীলতা, শিশিরকুমারের জীবন থেকে তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। নাট্যশালাকে শিশিরকুমার কি দৃষ্টিতে দেখতেন তা তাঁরই মুখের নীচের বক্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি : "নাট্যশালাকে উন্নত করতে হলে সর্বাগ্রে মনের ভিতর থেকে নাট্যশালার সম্বন্ধে যে অনাদরের ভাব আছে তা দূর করা দরকার। নাট্যশালা জাতীয় কৃষ্টির ধারক ও বাহক। এই নাট্যমঞ্চে এসে সকল কলা মিলিত হয়। নৃত্য-গীত, অভিনয়, সাহিত্য, ইতিহাস, নাট্য সকলেরই বিকাশ। সর্বজাতির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা নাট্যকার। সাহিত্যের মধ্যমণি নাট্য। অভিনয় ব্যতিরেকে নাট্য সম্পূর্ণ হয় না। অতএব নাট্যশালার উৎকর্ষ আমাদের জাতীয় প্রয়োজন।" এই 'জাতীয় প্রয়োজন' সম্বন্ধে শিশিরকুমার জীবনের প্রথম থেকে সচেতন ছিলেন বলেই তিনি রঙ্গমঞ্চকে করে তুলেছিলেন একই সঙ্গে পেশা ও নেশা। অভিনয় ও রঙ্গমঞ্চ পরিচালনা তাঁর পেশা হলেও অধিক অর্থ লাভের আশায় নাটকাভিনয়ের মানকে খাটো করে তিনি কোনদিন শস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করেন নি। বরং তিনি তাঁর উচ্চাঙ্গের অভিনয় কলা ও প্রয়োগনৈপুণ্যের সৎ দৃষ্টান্ত থিয়েটার-রসিক জনসমাজের কাছে উত্থাপন করার অক্লান্ত প্রয়াসে অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্তই হয়েছেন। তবু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর আদর্শচ্যুতি ঘটে নাই। এই বৈশ্যযুগে এ ধরণের আদর্শনিষ্ঠা সত্যই বিরল। অর্থোপার্জন যদি তাঁর জীবনের লক্ষ্য হত তাহলে তাঁর অভিনয় নৈপুণ্য বিক্রি করে অনেক অর্থ তিনি অর্জন করতে পারতেন। অধ্যাপনা ত্যাগ করে তিনি যখন প্রথম মঞ্চে যোগ দেন তখন সেই যুগে জে এফ ম্যাডন তাঁকে অভিনেতারূপে মাসে এক হাজার টাকায় চাকুরিতে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এমন লোভনীয় চাকুরিও তিনি গ্রহণ করেন নি। তার কারণ তিনি জানতেন যে বাংলার রঙ্গমঞ্চে তাঁর বিশেষ একটি মিশন আছে এবং চাকুরির মাধ্যমে তা পালন করা সম্ভব নয়। তাই চাকুরি গ্রহণ না করে নিজে নাট্যসম্প্রদায় গঠন করে বাংলার নাট্যরসিক জনসমাজের সম্মুখে উন্নত শিল্পরুচি ও মননশীলতার পরিচয় দিতে এগিয়ে গেলেন। এ পথে অনেক বিপদ, অনেক অনিশ্চয়তা তা জেনেশুনেও তিনি এগিয়ে যেতে দ্বিধা করেন নি।

শিশিরকুমারের মত বিপ্লবী প্রতিভাকে যে অর্থ দিয়ে কেনা যায় না—এসত্য তাঁর জীবনে একাধিকার প্রমাণিত হয়েছে। বাংলা রঙ্গমঞ্চে তাঁর যখন জীবন আরম্ভ, তখন থেকে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পেরও সূত্রপাত। চলচ্চিত্রশিল্পের ক্রমিক অগ্রগতির ফলে রঙ্গমঞ্চের অগ্রগতি যে কিয়দংশে ব্যাহত হয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই অবস্থায় যাঁরা পেশাদার অভি-

নেতা তাঁরা অধিক অর্থোপার্জনের আশায় একই সঙ্গে মঞ্চে ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করতেন। শিশিরকুমারের সমসাময়িক বহু অভিনেতা অভিনেত্রী এইভাবে একই সঙ্গে দুনৌকায় পা দিয়ে যথেষ্ট অর্থোপার্জন করেছেন। শিশিরকুমারও চিত্রাভিনয়কে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করলে যে প্রভূত অর্থোপার্জন করতে পারতেন সে বিষয়ে সংশয় নেই। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ আকর্ষণ তাঁকে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের দিকে প্রলুব্ধ হতে দেয় নি। তা ছাড়া, চলচ্চিত্র অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্য বজায় রেখে চলারই পক্ষপাতী ছিলেন। প্রায় ক্ষেত্রেই তিনি যে চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে রাজী হতেন তার পরিচালকও হতে চাইতেন নিজে। তাঁর প্রায় ৪০ বৎসর ব্যাপী অভিনয়-জীবনে তিনি যেখানে প্রায় ৩৬টি নতুন নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন সেখানে সবাক ও নির্বাক যুগ মিলিয়ে তাঁর অভিনীত চলচ্চিত্রের সংখ্যা মাত্র ৯। এই ৯টির মধ্যে আবার ছয়টি চলচ্চিত্রের পরিচালকও ছিলেন তিনি নিজে। এই প্রসঙ্গে চলচ্চিত্রাভিনয় সম্বন্ধে শিশিরকুমারের নিজের একটা অভিমতের উল্লেখ না করে পারছি না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিংবা ঠিক তার পরে পরেই শিশিরকুমার একবার দেউলিয়া হতে বাধ্য হয়েছিলেন। আদালতে যখন তাঁর দেউলিয়া হবার আবেদনের বিচার চলছিল তখন বিচারপতি জানতে চেয়েছিলেন শিশিরকুমারের মত প্রতিভাবান অভিনয়শিল্পী চলচ্চিত্রে অভিনয় করে প্রভূত অর্থোপার্জনের সুযোগ নেন না কেন। তদুত্তরে শিশিরকুমার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছিলেন যে চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে তাঁর ভাল লাগে না—মঞ্চাভিনয়কেই তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ সাধনা বলে মনে করেন। এর মধ্যে কোন অত্যুক্তি নেই, শিশিরকুমার ভাদুড়ী সম্বন্ধে এইটিই পরম সত্য। বাংলার রঙ্গমঞ্চকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন এবং দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তিনি সে ভালবাসার ঋণ শোধ করে গেছেন।

বাংলা নাট্যশালায় শিশিরকুমারের একমাত্র পরিচয় শুধু অদ্বিতীয় নট হিসাবেই নয়। নট হিসবে তিনি তো অদ্বিতীয় ছিলেনই নাট্যাভিনয়ের প্রয়োগকর্তা ও নাট্যশিক্ষক হিসাবেও তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। নট হিসাবে যেরূপ অপূর্ব উদাত্ত কণ্ঠের অধিকারী তিনি ছিলেন, যে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাঁর ছিল তা প্রায় বিরল বললেও অত্যুক্তি হয় না। বাংলার অভিনয় শিল্পে মার্জিত রুচি তথা মননশীলতার প্রথম প্রবর্তক শিশিরকুমার। অভিনয় মানে মঞ্চের উপর হাত পা ছোঁড়া নয়, অভিনয় মানে হৃদয়াবেগের তারতম্য অনুসারে কণ্ঠস্বরের ওঠা নামা, অভিনয় মানে চোখমুখের ভাব ব্যঞ্জক অভিব্যক্তি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শিশিরকুমারের কণ্ঠস্বর ছিল অবিকৃত। অভিনেতারা যে বয়সে অবসর গ্রহণ করেন, সেই বয়সেও শিশিরকুমারকে দেখেছি মাইকেল মধুসূদনের ভূমিকায় অভিনয় করতে। বৃদ্ধ শিশিরকুমার যুবক মাইকেল সাজলে বেমানান লাগত ঠিকই, কিন্তু সে বৈসাদৃশ্য ভুলে গেলে তাঁর অভিনয় মনে হত অপূর্ব। আর তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের আবৃত্তি—সেক্‌সপীয়ার ও মিল্টন থেকে তা আজও কানে বাজে! অভিনয়কলায় শিশিরকুমারের যে জুড়ি ছিল না তার একটি প্রমাণ বহু বিচিত্র ভূমিকায় নানারূপে তাঁর মঞ্চাবতারণ। অধিকাংশ বড় অভিনেতাই বিশেষ বিশেষ ধরণের নির্দিষ্ট ভূমিকাভিনয়ে সুদক্ষ। সকল শ্রেণীর চরিত্রাভিনয়ে তাঁদের দক্ষ দেখা যায় না। শিশিরকুমার ছিলেন এক্ষেত্রে তাঁর ব্যতিক্রম। জীবনে ছোট ছোট বড় নানা রকমের, নানারসের চরিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন সমান দক্ষতার সঙ্গে। এটা তাঁর প্রতিভার ব্যাপকত্ব ও গভীরত্বের কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রয়োগকর্তা ও নাট্যশিক্ষক হিসাবে শিশিরকুমারের দানের দিকটা আলোচনা করলেই মোটামুটি রঙ্গমঞ্চের এই অবিস্মরণীয় বিরাট পুরুষের চরিত্রের প্রায় সকল দিকই আলোচনা

করা হবে। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের যখন আবির্ভাব তখন প্রয়োগকর্তা হিসাবে কারও অস্তিত্ব ছিল না আমাদের নাট্যশালায়। সামগ্রিকভাবে নাট্য প্রয়োজনা বড় একটা কেউ করতেন না। নিজের নিজের ভূমিকায় প্রায় প্রত্যেক অভিনেতা অভিনেত্রীই থাকতেন স্বপ্রধান। মঞ্চসজ্জা ও মঞ্চব্যবস্থাপনা নিয়েও বড় একটা কেউ মাথা ঘামাতেন না। শিশিরকুমারই বাংলা নাট্যাভিনয়ে প্রথম সার্থক প্রয়োগকর্তা। তিনি শুধু নিজের ভূমিকাটি ভালভাবে শিখেই নিজেকে দায়মুক্ত মনে করতেন না—প্রতিটি ভূমিকার অভিনয় পদ্ধতি তিনিই স্থির করে দিতেন এবং প্রয়োজন বোধে সামগ্রিক অভিনয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের প্রয়াস পেতেন। মঞ্চ সজ্জা ও মঞ্চ ব্যবস্থাপনাতেও তিনি সাধ্যানুসারে শ্রম নিয়োগ করতেন। পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চে এই ধরণের প্রয়োগকর্তার অস্তিত্ব থাকলেও বাংলা নাট্যশালায় শিশিরকুমারের পূর্বে সার্থক কোন প্রয়োগকর্তার অস্তিত্ব দেখা যায় নি। শিশিরকুমারের সমসাময়িক কালে এবং তাঁর পূর্ববর্তী যুগে আমরা বাংলা রঙ্গমঞ্চে শক্তিশালী বহু অভিনেতার সাক্ষাৎ পেয়েছি। ব্যক্তিগত অভিনয়নৈপুণ্যে তাঁদের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য হলেও অভিনয় শিক্ষা দেবার ক্ষমতা তাঁদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় নি। এদিক থেকেও শিশিরকুমার ছিলেন অতুলনীয় অভিনয় শিক্ষক। এভাবে ধৈর্য ধরে নাটকের মহড়া দিতে এবং নাটকের প্রতিটি চরিত্রের অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে নিজে নির্দেশ দিয়ে নাট্যশিক্ষা দিতে কাউকে দেখা যায় নি। ফলে বাংলার নাট্যশালায় শিশিরকুমারের একটি শিষ্যশ্রেণী গড়ে উঠেছিল অতি দ্রুত। এই শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই অভিনয়ে প্রভূত খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন। শিশিরকুমার এক একটি করে নাট্যসম্প্রদায় গঠন করতেন এবং তার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসত এক এক দল সুশিক্ষিত নটনটী। কিছুটা খ্যাতি অর্জন করে এঁরা আবার যখন শিশির সম্প্রদায় ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতেন নিজেদের জীবিকা অর্জনের চেষ্টায়, তখন শিশিরকুমার আবার নতুন অভিনেতা অভিনেত্রীকে হাতে তুলে নিতেন শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে। শিশিরকুমারের এই অভিনয় শিক্ষার ঐতিহ্য আজও আমাদের রঙ্গমঞ্চকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। তাঁর বহু শিষ্যশিষ্যা নিজেদের অভিনয়নৈপুণ্যে বাংলা নাট্যশালাকে করে তুলেছেন প্রদীপ্ত ও ভাস্বর। অভিনয়ের সামান্য ক্ষমতা যাঁর মধ্যে থাকত, শিশিরকুমারের কাছে শিক্ষার সুযোগ পেলে তিনিও হয়ে উঠতে পারতেন নিপুণ অভিনেতা।

অনেক মানুষ থাকেন যাঁরা জীবনে স্বপ্নই দেখে যান, সে স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করার সুযোগ তাঁরা পান না। বাংলা রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমার ছিলেন এমনই এক স্বপ্নদ্রষ্টা। তাঁর জীবনের একটি বড় স্বপ্ন ছিল জাতীয় নাট্যশালা স্থাপন করে জাতির নাট্যশিল্পকে স্থায়ী ভিত্তিতে স্থাপন করা। আজ জাতীয় নাট্যশালা স্থাপনের কথা সকলের মুখেই শোনা যায়। দুই এক বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে যদি জাতীয় নাট্যশালা স্থাপিত হয়, তাতেও বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। বরং এরূপ সম্ভাবনাই খুব প্রবল। যখন জাতীয় নাট্যশালার কথা কেউ ভাবতেই পারতেন না সেই ১৯২১-২২ সালেই শিশিরকুমার জাতীয় নাট্যশালা স্থাপনের কথা ভেবেছিলেন এবং তাঁর এ স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার ব্যাপারে তিনি উৎসাহ পেয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মত ভারত বরেণ্য নেতার কাছ থেকে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রও তাঁর পরিকল্পনার বড় একজন সমর্থক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের মত মনীষীদের সাহচর্য ও সমর্থনও তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু নানা প্রতিকূল অবস্থার দরুণ তাঁর জীবনে এই স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয় নি। এমন কি দেশ স্বাধীন হবার পরেও তাঁর এই আজীবনের পরিকল্পনার রূপায়ণ ত্বরান্বিত হয় নি। তাই বৃদ্ধবয়সে আশাভঙ্গের মনস্তাপে শিশিরকুমার হয়ে উঠেছিলেন নৈরাশ্যবাদী। শেষ জীবনে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেও তিনি বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

এই অবস্থায়ও শিশিরকুমার কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও নিজের প্রতিভাকে পণ্য করে তোলেন নি, নতি স্বীকার করেন নি প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের কাছে। সর্বপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে উন্নত শির নিয়েই তিনি চিরনিদ্রায় অভিভূত হয়েছেন। মৃত্যুর মাঝেও তিনি নিজেকে পুনরায় মহনীয় বলে প্রতিপন্ন করেছেন। আদর্শের প্রতি এই ঐকান্তিক নিষ্ঠা, আদর্শের জন্যে ত্যাগ স্বীকারের এরূপ মহান দৃষ্টান্ত আজকের দিনে বিরল। কলেজ জীবনে শিশিরকুমারের সহপাঠী ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শিশিরকুমারের মৃত্যুর পরে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে বলেছেন যে তাঁর চরিত্রে বরাবরই একটা অহমিকা ছিল এবং তিনি কোন দিনই অর্থ বা কোন সুযোগ সুবিধার কাছে নতি স্বীকার করেন নি। এ অহমিকা হল প্রতিভার সহজাত জিনিস এবং এ অহমিকা নিন্দনীয় নয়। এ অহমিকা আত্ম-বিশ্বাসেরই নামান্তর। নিজের উপর তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল বলে এবং আদর্শনিষ্ঠা তাঁর চারিত্রিক ধর্ম ছিল বলেই নিজের প্রতিভাকে তিনি জাতির অকুণ্ঠ সেবার নিয়োজিত করেছিলেন, তাকে হাটের পণ্য করে নিজের ইহকালের চাষ কুসুমাস্তীর্ণ করার ব্যবস্থা করেন নি। শেষ-জীবনে ভাগ্যবিড়ম্বনায় তাঁকে যখন 'শ্রীরঙ্গম' মঞ্চ ত্যাগ করে অভিনয় জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করতে হয়, তখন তিনি ইচ্ছা করলে যে কোন পেশাদার মঞ্চে মাইনে-করা যে কোন উচ্চ পদ লাভ করে জীবনযাত্রার পথ সুগম করতে পারতেন। কিন্তু প্রতিভাবান শিল্পীর অহমিকা তাঁকে এই দাসত্ব বরণ করতে দেয় নি। এই মানুষটিকেই আবার দেখেছি ওনং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীটের গ্রন্থজগতের সঙ্কীর্ণ ঘরে দিনের পর দিন নব নাট্য সংসদের অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে মহড়া দিতে। যে নাট্যাভিনয়কে তিনি কৈশোরের স্বপ্ন, যৌবনের ধর্ম বলে গ্রহণ করেছিলেন, শেষ জীবনেও তাকে আঁকড়ে ধরেই তিনি বাঁচার প্রয়াস করেছিলেন। অর্থের জন্যে কারও কাছে নতি স্বীকার না করে শিশিরকুমার তাঁর নবনাট্য সংসদের তরুণ সহযাত্রীদের নিয়ে মফস্বলে নাট্যাভিনয় করে বেড়াতেন। প্রতিভার এই অহমিকাই ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। বাংলা রঙ্গমঞ্চ যতদিন থাকবে ততদিন নাট্যামোদী মাত্রই সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করবে বাংলা নাট্যশালার অবিস্মরণীয় পুরুষ শিশিরকুমারের কথা।

সান্নিধ্য

চিন্তামণি কর

আমাদের বাড়ীর সীমানা ঘেঁসে ছিল বেশ বিস্তৃত একটি বাঁশবন। তখনও শহরের ক্রমবিস্তার এ অঞ্চলের গ্রাম্য পরিবেশকে গ্রাস করে স্লাম্‌এ পরিণত করেনি। এই বাঁশবনটিকে রঙ্গমঞ্চ করে আমার শিশুমন কল্পনায় কত রোমঞ্চকর অভিযানের অভিনয় করেছে।

ঝরাপাতার তামাটে সোনালী আবরণকে ভেদ করে উঁকি দিত কাঁচ বাঁশের অঙ্কুরগুলি। হাল্‌কা তাজা সবুজ রঙের এই নরম নধর ফলাগুলি আঙ্গুল দিয়ে প্রত্যহ মেপে তাদের দৈনিক বর্দ্ধনের পরিমাপকে ধরবার চেষ্টা করতাম। কত রূপকথার রহস্য যেন লুকান ছিল এই নির্জ্জন বনের গভীরে। অন্যের চোখে এর বিস্তার চারিদিকে উন্মুক্ত হলেও আমি দেখতাম এরই মধ্যে লৌহপ্রাকারে ঘেরা রাজপুরী যার বিরাট সিংহদ্বারে পাহারা দিচ্ছে অতিকায় এক দৈত্য। সে নিস্তব্ধতার রূপ নিয়ে নিষ্পলক চোখে চেয়ে আছে দিবারাত্র। তার ভয়ে প্রজাপতি, ফড়িং আর গীরগিটিরাও তাদের ক্ষিপ্র ও সন্ত্রস্ত গতিবিধিতে আওয়াজ চেপে চলছে। ঝিঁঝাঁরাও তাদের একটানা সুরে ফাঁক ফেলতে সাহস করে না পাছে এই নিরবিচ্ছন্নতার পরিবেশে যদি কোথাও পড়ে যায় দাঁড়ি।

ঝুলনে মত্ত দোদুল্যমান বুনোলতার ডগাগুলি সামনে ও পাশের কঞ্চির সঙ্গে বেঁধে জাল বুনে দিতাম। আমার ধৈর্য্য ও অপেক্ষা ইনাম পেত সময়ে পাতায়-ভরা এক মনোরম চাঁদোয়ার। তারই নিচে শুখনো পাতার স্তূপকে গদী বানিয়ে হ'ত আমার সিংহাসন। ভাবতাম যে আশেপাশের কীটপতঙ্গরা আসলে ছিল মানুষ কোন এক মায়াবীর যাদু তাদের দিয়েছে এই রূপান্তর। একদিন না একদিন তারচেয়ে জোরালো যাদু শিখে ফেলে এদেরকে ফের মানুষ করে মুক্তি দিয়ে দেব। তাদের সহচর করে প্রহরী দৈত্যকে লড়াইএ হারিয়ে দিয়ে করব তাকে বন্দী। সিংহদ্বার ভেঙ্গে ঢুকব ঘুমন্ত পুরীতে ও রাজকন্যার মায়া ঘুম ভাঙিয়ে জানিয়ে দেব যে আর ভয় নেই। মায়াবীর মায়াজাল উড়িয়ে দিয়ে এনেছি মুক্তি। কখনও শুকায় না এমন ফুলের বরমালো সে রূপসী দেবে আমায় যোগ্য পুরস্কার।

সাপ, শেয়াল আর ভূতের ভয়ে এই বেনুবনের গভীরে আর কেউ যেতে সাহস করত না তাই ধরে নিয়েছিলাম যে আমার কল্পপুরী কায়েমীভাবে এখানে উপদ্রবহীন ও নিরাপদ। কিন্তু মানুষের সান্নিধ্যে শান্তির মেয়াদ হয়ে যায় সংক্ষেপ। তাই একদিন দেখি অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কোন দুর্বৃত্ত আমার রাজতক্তের করেছে অমর্য্যাদা ও ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে লতায় বোনা সে অমূল্য চন্দ্রাতপ।

রাগ, দুঃখ ও ক্ষোভে খান খান হৃদয়কে একত্রিত করে আবার লতার ছিন্নভিন্নগুলিকে সাজিয়ে দিলাম। ভাবলাম কালে আবার ফিরে পাব আমার হারান চন্দ্রাতপ। কিন্তু এই দুস্কিয়ার পাষণ্ড যেন আমার প্রচেষ্টাকে বরাবরের জন্য নষ্ট করতে সকলের অলক্ষ্যে পরদিন লাগিয়ে দিল শুখনো পাতার স্তূপে আগুন। মুহূর্তে বনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত লেলিহান আগুনের শিখায় পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। সমবেত জনমণ্ডলী নিরুপায় ও সামর্থহীন-ভাবে লকলকে অগ্নিতরঙ্গের এই তাণ্ডবনৃত্য দাঁড়িয়ে কেবল দেখতে লাগল।

নীচের বহ্নিমান পাতালতাগুল্ম ভস্মীভূত হতে হতে রসাল কাঁচা বাঁশ তাপে শুকিয়ে

শিখাকে তুলতে লাগল আকাশের দিকে। ক্রমে যেন হাজারে হাজারে অতিকায় মশাল সহসা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল। যা কিছু গ্রাস করার ছিল তাকে ভক্ষণ করে যখন এই দাবানল নিভে ঠাণ্ডা হল তখন পড়ে রইল অঙ্গার ও ভস্মেভরা কালো পোড়া মাটির এক মাঠ।

বর্ষার পরে সেই কালো নির্জ্জীব মাটির রঙকে বদলিয়ে এল লতাগুল্ম ও নব অঙ্কুরের আবরণ। এই বনে আবার লেগে গেল জানোয়ার পাখী ও পোকার ভিড়। প্রকৃতির এই পুর্ন-প্রতিষ্ঠায় যেন হর্ষোৎফুল্ল হয়ে দ্রুত বর্দ্ধমান সুপুষ্ট বাঁশ গাছগুলি মাথা দুলিয়ে সাদর আহ্বান জানাতে লাগল। সময় ও প্রকৃতি যোগাযোগ করে সবুজের একটা মোটা আবরণ টেনে মানুষের দুস্কিয়ার চিহ্নকে প্রায় অবলুপ্ত করে দিল। কিন্তু মনে ছেপে যাওয়া সে অঙ্গারে ভরা দগ্ধবনকে শত রঙএর প্রলেপ চাপা দিতে গেলেও লতাগুল্ম ও গাছের কয়লা কঙ্কাল-গুলি সে লেপনকে দলিত করে স্মৃতির পর্দ্দায় সুস্পষ্ট করে দেয় এক দুষ্কৃতির কালিমাকে।

পাপা লুসিয়ান, এন্দ্রা ও রিদনিক

১৯৩৯ এর পয়লা সেপ্টেম্বর ফ্রান্স হিটলারীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। যদিও কয়েক মাস যাবৎ বিশ্বজনীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও তার নিশ্চিত পরিণতি সম্বন্ধে কারুর মনে কোন সন্দেহ ছিল না, সকলেই যেন সামনে দাঁড়ান যুদ্ধের ভয়াবহ মূর্তিকে চোখ বন্ধ রেখে তার কোন অস্তিত্ব নেই বলে মনকে ঠেরাবার চেষ্টা করছিল।

যুদ্ধ ঘোষণা করার পরে পারী শহরে বাহ্যত দৈনন্দিন জীবনে কোন পরিবর্তন না দেখা গেলেও দারুণ ভয় ও উদ্বেগ যে একটা প্রচণ্ড ঝাপটা দিয়ে সকলের মনকে আচ্ছন্ন করেছিল তার একটা ব্যাপক অভিব্যক্তিকে লক্ষ্য না করে চলা সম্ভব ছিল না।

ফ্রান্সএর সঙ্গে জার্ম্মানীর যে লড়াই লেগেছে এ না জেনেই ঐদিন সকালে প্যাভিয়ঁ-ল্লোর রেফিউজি কাম্পে রওনা হয়েছিলাম। সেখানে পৌঁছে দেখি এক বীভৎস দৃশ্য। মেয়েরা সব চিৎকার করে মাটিতে লুটোপুটি খেয়ে চুল ছিঁড়ছে, বৃদ্ধারা বুক চাপড়ে হায় হায় করে মুখে আপনহাতের নখ বসিয়ে মাংস উপড়ে ফেলার চেষ্টায় রক্তারক্তি কাণ্ড করেছে আর পুরুষরা যেন পক্ষাঘাতে কিচল নীরব ও তারা বসে পড়েছে আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষামান হয়ে।

খোঁজ করে জানলাম এই বিয়োগান্ত দৃশ্যের নিদারুণ আক্ষেপের রচয়িতা হচ্ছে মাজোভিয়েস্কি। সকালের রেডিওতে যুদ্ধ ঘোষণার সংবাদ শুনেই ক্যাম্পের অভিমুখে সে যাত্রা করে এবং পথে আসতে অতিরঞ্জিত গুজব যে "জার্ম্মান সৈন্য প্রায় পারী শহরে পৌঁছাল বলে," শুনে সে খবরটি সবিস্তার সে রেফিউজিদের জানিয়ে দেওয়ায় ভয়ের আকস্মিক আঘাতে তারা সকলে প্রায় উন্মাদ হয় গিয়েছে।

মাজোভিয়েস্কিকে বল্লাম "তুমি কোন বুদ্ধিতে এই বাজে গুজব শুনিয়ে এদের মধ্যে একেবারে "ম্যাস্ হিস্টিরিয়া" এনে ফেলেছ। এরা এক সংগ্রামে হৃতসর্ব্বস্ব হয়ে ও নিরাপদের আশ্বাসে ছিন্নবিচ্ছিন্ন জীবনকে একজোট করে বাঁচতে আশান্বিত হয়েছিল। কিন্তু অভাগা এরা সে আশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ় হবার আগে আবার পড়েছে এই বিরাট যুদ্ধের বিভীষিকায়। এই রেফিউজিদের ভয়স্পর্শকাতর মনকে তুমি কোন আক্কেলে বিনা কারণে এমন করে ভেঙ্গে চুরে দিয়েছ।"

সে বল্লে 'যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবি ফল আজ না হয় কাল এদের উপর এসে পড়বেই তাই চরম খবরটা জানিয়ে দিয়ে এদের মনকে তৈরী হবার একটা ব্যবস্থা করেছি'

বল্লাম "আর এই অতিরঞ্জিত ও মিথ্যা বাজারে খবরটা কি বলেছ এদের মনকে শক্ত করবার একটা মোক্ষম উপায় ভেবে।"

তার প্রতি রাগ আর অনুযোগ করে কোন লাভ ছিল না তাই বিকৃত মস্তিষ্ক রেফিউজিদের প্রকৃতিস্থ করা যায় কিনা তার চেষ্টা করতে লাগলাম। মাজোভিয়েস্কির খবরটাকে ভুল প্রতিপন্ন করা খুব মুস্কিল হল না। বল্লাম তাদের যে শত্রু সৈন্যকে পারীতে পৌছাতে গেলে তার আগে এখান দিয়ে যেতে হয়ে কাজেই তারা সেখানে গিয়েছে এ সংবাদ মিথ্যা।

আমি এখুনি সঠিক খবর শহর থেকে শুনে এলাম যে সীমান্তে ম্যাজিনো লাইনের বাইরে দু পক্ষের গোলা বর্ষণের মহড়া চলছে মাত্র। তারা কোনদিন যে সে লাইনের এপারে আসতে পারবে তা মনে হয় না।

সত্যি বলতে কি প্রথমে এই ম্যাজিনো লাইনকে ফরাসীরা প্রায় সকলেই যুদ্ধকে সীমান্তে ধরে রাখবার অব্যর্থ রক্ষাকবচ বলে ধরে নিয়েছিল। বেলজিয়াম-এর দুর্বল প্রতিরোধকে ভেঙ্গে অরক্ষিত সেই সীমান্ত দিয়ে ম্যাজিনো লাইনের প্রান্তকে ঘুরে জার্ম্মান সৈন্যবাহিনী যখন ফরাসী সৈন্যদের পিছনে এসে গিয়েছিল তখনও নিজেদের সুরক্ষিত ও নিরাপদ বিশ্বাসে সমানে সমানে তারা কামান দেগে যাচ্ছিল। এক স্ট্রাটেজির সাফল্য সম্বন্ধে এই দৃঢ় আস্থাকে ব্যর্থ করে যখন সামরিক পরিস্থিতি রক্ষার নিশ্চিত ব্যবস্থার বিশ্বাসে উপস্থিত করল এক বিরাট বঞ্চনা, ফরাসী সৈন্যদের তখন এসেছিল মনোবল ও সাহসে ভীষণ ভাঙ্গন ও হতাশা। এরপর জার্ম্মান বাহিনীর ফ্রান্সে দ্রুত অগ্রসরে আর কোন উপযুক্ত বাধা আসেনি।

এই দুর্ব্বিপাকে বিষাদ রেফিউজিদের মধ্যে একজনকে সবচেয়ে বেশী আক্ষেপ ও বিলাপ করতে দেখা যত তিনি কিন্তু এই সর্ব্বহারাদের কেউ ছিলেন না। রেফিউজি ছেলেমেয়েরা তাঁকে ডাকত 'পাপা লুসিয়ান' বলে।

কাম্পের আশে পাশে যে সব সহানুভূতিশীল কৃষকরা শাকসব্জী ফলমূলাদি দিয়ে রেফিউজিদের সাহায্য করতেন লুসিয়ান্ ছিলেন তাঁদেরই একজন। প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় এক থলে বোঝাই আলু বা অন্য কিছু ফলমূল এনে তিনি ডাকতেন সব ছেলেমেয়েদের—বিশেষ করে মেয়েদের, এবং আলিঙ্গন ও চুম্বনে সম্ভাষণ জানিয়ে তাদের হাতে সেসব বিলিয়ে দিতেন। সেখানে সকলেই জানত যে এই বৃদ্ধের শুভেচ্ছা জানাবার আড়ম্বর ঠিক বাৎসল্যের পর্য্যায় ভুক্ত ছিল না।।

ছেলেমেয়েরা সব চলে গেলে মঃ লুসিয়ানা চোখে একটা কদর্য্য ঝলক টেনে বলতেন "বেশ লাগে এই প্যানিস মেয়েদের। রোদ পেয়ে দ্রুত বর্দ্ধিত পরিপুষ্ট ফলের মত এদের দেহটি কেমন সুন্দর অল্প বয়েসেই পরিপূর্ণ হয়ে যায়। যে বয়েসে এরা যৌবনভারে টলমল করে সে বয়েসে আমাদের ফরাসী মেয়েরা অঙ্কুর অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারে না। আপশোষ এই যে দেহের দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে স্প্যানিস মেয়েদের মনটা বাল্যের প্রভাব কাটিয়ে সেই তালে পাকতে চায় না। আর আমাদের মেয়েদের দেখ, জন্ম থেকেই তারা ককেত্।"

"কাম্পে এই সব মেয়েদের মায়েরা সমাজে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে লুসিয়ানের পাপ-চক্ষুকে অগ্নিময় শলাকা দিয়ে নিশ্চয়ই অন্ধ করবার ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু অবস্থার ফেরে দায়ে পড়ে তার লালসার ইঙ্গিত ভরা অভ্যর্থনাকে মেয়েদের বরদাস্ত করতে দিতে তাঁরা বাধ্য হতেন।

ছোট হলেও ছেলেমেয়েরা সকলেই লুসিয়ানের এই স্নেহাভিব্যক্তিকে ভালভাবে বুঝে নিয়েছিল তাই কোন মেয়েকে তিনি স্বাগত জানাতে বল্লে তারা চেঁচিয়ে বিদ্রূপের স্বরে বলত

যদি ভাগে বেশী চাস তো পাপা লুসিয়ানকে একটু দীর্ঘ ও গাঢ় আম্ব্রাস্ (আলিঙ্গন) দিয়ে দিস্।"

যুদ্ধ ঘোষণার দিন ভয় ও ভাবনায় অবসন্ন পাপা লুসিয়ানকে যখন মেয়েরা এল রোজকার-মত স্বাগত জানাতে, তাদের অগ্রসরকে থামিয়ে তিনি বল্লেন "থাক বাছারা আমার কাছে আর এগিয়ে এসনা। আমি অতিশয় পাপী। তোমাদের মন্দ ভাগ্যের সুযোগ নিয়ে বাৎসল্যের ভানে আমি চেষ্টা করেছি স্পর্শে মনের মন্দ ইচ্ছা চরিতার্থের। আজ বাদে কাল যখন স্যাল্ বস্রা আমাদের দেশ অধিকার করে বসবে তখন ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আমার একমাত্র কন্যা ইবোন্কেও হয়ত তাদের কদর্য্য লালসার শীকার হতে হবে। আজ থেকে তোমাদের প্রতি আমার স্নেহে ইবোনের সঙ্গে কোন তফাৎ রাখাছিনা। তোমরা আদর করে আমার নাম দিয়েছ পাপা লুসিয়ান্ চেষ্টা করব সে নামের মর্য্যাদা রাখতে।"

ভার্দুর বিজয়স্মৃতি, ম্যাজিনো লাইন্ বৃদ্ধ জেনেরাল্ পেত্যাঁ কি গামল্যাঁর সৈন্য নেতৃত্ব, ফ্রান্সের সাধারণ লোকের মনে আনতে পারেনি দেশ ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের বিশ্বাস। যুদ্ধের আরম্ভেই লুসিয়ানের মত অনেকে তাদের পতন যে অনিবার্য্য এ বিশ্বাস করে নিয়েছিল। হতাশায় রিক্ত ও অভিভূত লুসিয়ানের দশা দেখে আপন দুঃখ দৈন্য ভুলে রেফিউজিরা পর্য্যন্ত তাঁকে সান্ত্বনা দিতে অগ্রসর হল।

সংঘাতের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন শহরে ও গ্রামে নাগরিকদের সাজপোষাক ও চাল-চলনে আসতে লাগল পরিবর্ত্তন। দোকানে, বাজারে, রাস্তায়, ক্যাফে ও রেস্তরাঁয় সক্ষম পুরুষদের সকলের ইউনিফরম্ পরা না থাকলেও মাথায় একটা খাকি টুপি চাঁড়য়ে জানাচ্ছিল যে যোদ্ধাদের তালিকায় তারা নাম লিখিয়ে এসেছে এবং হুকুমের অপেক্ষায় আছে।

ধীরে ধীরে যুবকদের সংখ্যা কমতে কমতে শহরে রয়ে গেল প্রথমে কেবল প্রৌঢ় ও বৃদ্ধরা ও পরে কেবল অথর্ব বৃদ্ধের দল। বিরস বিষণ্ণ এরা সর্ব্বদাই শোকাতুর।

বিনা ইউনিফরমে কোন যুবকের পক্ষে ক্যাফে বা রেস্তরাঁয় গিয়ে খেতে বসা হয়ে দাঁড়াল এক কঠিন পরীক্ষা, কারণ সামনে ও আশেপাশে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের পানীয় বা খাদ্য নিয়ে বসে থাকতে দেখা যাবে। তাদের হাত যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ায় তারা পানীয় বা খাদ্য স্পর্শ করবে না আর নীরব শোক ও দুঃখে তাদের গন্ড বেয়ে ঝরতে থাকবে অশ্রুধারা ও মাঝ মাঝে ফুঁপিয়ে বের হবে দীর্ঘশ্বাস।

যোদ্ধার পোষাক পরা কোন যুবক তাদের দৃষ্টির নাগালে পড়লে তাদের সকরুণ চোখ যেন বলতে থাকে "আহা বেচারী এই তরুণ যে সীমান্তে পাড়ি দেবার জন্যে নির্ব্বাচিত হয়েছে সেখানে থেকে আর ফিরবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু যুদ্ধে যে সংশ্লিষ্ট নয় এমন প্রমাণ বিহীনভাবে যদি কোন যুবক এসে পড়ে তাদের দৃষ্টির পরিধির মধ্যে অমনি তাদের চাউনি হয়ে উঠবে কঠিন ও তীক্ষ্ম, তাদের চোখ উপরে উঠবে ভৎর্সনায় ও উপেক্ষায়। মনে হবে তারা অব্যক্ত বাক্যে বলছে "যুবক হয়ে গায়ে ফুদিয়ে আমোদ করে বেড়াতে লজ্জা করে না যখন আর সকলে লড়াইএ মরবার জন্যে প্রস্তুত।"

এদের প্রশিক্ষণ গ্রহণকে এড়াবার জন্যে বিদেশী যারা যুদ্ধে যোগ দিতে চায় তার জন্য কেন্দ্রে গিয়ে একদিন নাম লিখে এলাম।। সেখানে জিজ্ঞাসা করল কি কাজে নামতে চাই।

বল্লাম "রেড্ক্রসএর ভলেণ্টিয়ার।"

কয়েকদিন পরে পারীর শহরগুলির এক সামরিক ক্যাম্পে যাবার হুকুম এল।

সেখানে যেতে কেন্দ্রের কমাণ্ড্যাণ্ট্ কড়া গলায় নির্দ্দেশ দিলেন ক্যাম্পের সামনের ময়দানে

দাঁড়ান লোকের সারীতে এ্যাটেন্‌সন্‌ হয়ে যেতে।

এই বেসামরিক পোষাক পরা আন্তর্জাতিক লোকের পঙক্তির সামনে ছিল অনেকগুলি ভারি ভারি চেহারার ট্রাক্‌।

সৈনিকপ্রবর আমাদের সারির এপার থেকে ওপার পর্য্যন্ত একটা প্রখর দৃষ্টির ফোকাস লম্বা দম নিয়ে মুখ ব্যাদনের এক অবিশ্বাস্য প্রসারে বার করলেন দুর্ব্বোধ্য ভাষার এক বজ্র নিনাদ।

আমার আশ পাশের সকলে সে হাঁক্‌ শুনা মাত্রই ছুটে ট্রাকে চড়ে চালাতে শুরু করে দিল। অফিসারটি খুব একটা বিশেষ উদ্দেশ্যভরা কদমে পা ফেলে আমার কাছে এসে সেই বজ্র ধ্বনির সুর ও মাত্রা বজায় রেখে আমায় ধমক দিয়ে বল্লেন "অপটু উজবুক হাঁকরে দাঁড়িয়ে আছ কি কারণে।

বল্লাম 'এখানে নবাগতকে কি করতে হবে তা আগে একটু না জেনে তাঁর সামরিক ভাষার দুর্ব্বোধ্য হুকুমকে সম্বর তামিল করা এ অধমের সামর্থে কুলোয়নি।'

তিনি আরো গালিগালাজ করে বল্লেন 'যে কেন্দ্র থেকে এসেছ সেখানে বলা ছিল ট্রাক ড্রাইভারএর জন্য লোক পাঠাতে। গাড়ীর সামনে দাঁড় করিয়ে' হুকুম দিয়েছি "চালাও" এর আবার বোঝাবুঝির কি আছে?'

সংক্ষেপে জানালাম "সত্যি এ অতি সরল প্রশ্ন কিন্তু যে কেন্দ্র থেকে আমায় পাঠিয়েছে তারা আমি ট্রাক চালাতে পারি কিনা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিল। এ বিভ্রাটের জন্য আমি দোষী নই।"

ফিরে আবার গেলাম সেই কেন্দ্রে।

এবার তারা বল্ল বিদেশী যারা লড়াইএ যোগ দিতে চায় তারা বিশ্বাসযোগ্য কিনা তার খোঁজ খবর হচ্ছে পুলিসের থানায়। সেখান থেকে লিখিয়ে নিয়ে এস আমাদের সরকার অননুমোদিত রাজনৈতিক দুষ্কর্ম্মে তুমি লিপ্ত নও তা হলে তোমাকে কোন কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করা হবে।

প্রফেস্তর দ্য পোলিসএ গেলে আমায় বলা হোল ভারতীয় তুমি, আমাদের লড়াই তোমার এত মাথাব্যাথা কেন? তুমি তোমার দেশে ফিরে যাও।

কিন্তু দেশে ফিরতে জাহাজ বা প্লেন এ জায়গা তখন পাওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল এবং পেলেও প্যাসেজ কিন্‌তে ইংরাজী ষ্টারলিং অথবা মার্কিন ডলার ছাড়া অন্য মুদ্রা কোন কোম্পানী নিতে রজী না, এমনকি ফরাসী কোম্পানীরাও ফ্র্যাঙ্ক নিতে খুব গররাজী ছিল। আমার তহবিলে ফ্র্যাঙ্ক ছাড়া আর অন্য কোন মুদ্রা ছিল না।

পারী থেকে লন্ডনের রাস্তা খুব দীর্ঘ নয়। কিন্তু ফ্রান্স্‌ থেকে পালাতে ব্যস্ত ধনীরা যত রকমের উপায়ে ইংলিস চ্যানেলের ওপারে যাওয়া যায় তার সবগুলিকে অর্থের বলে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে রেখেছিল।

পুলিসের অফিসে বলে এলাম হয় আমাকে তাদের দেশত্যাগের সুবিধা করে দিতে হবে না হলে যুদ্ধের কোন কাজে আমাকে লাগাতে হবে। অন্য কোন উপায়ের কিনারা না দেখতে পেয়ে তারপর ঘটনার স্রোতাবর্তে একরকম নিজেকে ভাসিয়ে দিলাম।

যখন আমরা কোন দুর্ঘটনার খবর পড়ি তখন কেউ নিহত হয়েছে শুনলে কেবল একটা সংবাদ জানার চেয়ে মনে বেশী কিছু ছাপ পড়ে না। কিন্তু সে সংবাদ যখন নিকট আত্মীয় বন্ধু ও প্রিয়জনকে নিহতের তালিকায় ফেলে দেয় তখন তার প্রতিক্রিয়া হয় মনে মর্ম্মান্তিকভাবে তীব্র।

বন্ধুদের মধ্যে রিদনিক্‌ এর ডনজুয়ান এর সুখ্যাতি ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা

শেষ করে সে কাজ নিয়েছিল এক ফ্যাক্‌টরীতে কেমিষ্টএর। যুদ্ধের আগে ইয়োরোপে ইহুদীদের প্রতি যে বিদ্বেষ উথলে উঠেছিল তাতে সবচেয়ে কুখ্যাতি আরোপ করা হয়েছিল পোলিস ইহুদীদের প্রতি। ভাবটা এই যে যদি রাস্তায় চলতে এক বিষাক্ত সাপ আর একটি পোলিস ইহুদী সামনে পড়ে তা হলে আগে তাকে মেরে পরে সাপকে নিধন করা উচিত। হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করার আগেই সেখানে এক সম্প্রদায় ইহুদী দলনে বেশ ব্যস্ত ছিল।

ইহুদী বংশজ সুপণ্ডিত অধ্যাপকদের চুল ও দাড়ি টেনে বেইজ্জত করা ছাত্রদের মধ্যে অনেকের এ হাঁব হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রিদনিক ছিল ইহুদী এবং পোল। কিন্তু তার মত সজ্জন দয়াবান ও নির্ভরশীল বিশ্বাসী বন্ধু খুঁজে পাওয়া ভার। তার একটি মাত্র দুর্বলতা ছিল যার জন্যে তাকে বন্ধুদের তরফ থেকে অনেক অনুযোগ শুনতে হত।

কোন আকর্ষণে বলা যায় না মেয়েরা প্রায়ই তার প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খেত আর বন্ধুবর তাদের প্রণয়কে প্রত্যহ প্রাতরাশ গ্রহণের মত নিয়ে যেন ধন্য করে দিতেন। আস্বাদের বৈচিত্র্য আনতে মেনু বদলের মত তাঁর প্রেমাস্পদাদের অধিকার পরিবর্তন হ'তে খুব ঘন ঘন।

কিন্তু সব নিয়মের যেমন ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভব তেমনি রিদনিক্‌এর বহু প্রেমিকা বিলাসকে খাটো করে একদিন একজন রূপের জালে তার হৃদয়কে পাকাপাকিভাবে বেঁধে ফেল্ল।

এন্দ্রা ছিল একাধারে রূপসী ও বিদুষী। আমরা অনেকেই এ মেনে নিয়েছিলাম যে তার রূপের এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যাকে সব বিশেষণ উজাড় করে বল্লেও ঠিকমত বর্ণনা দেওয়া হ'ত না। এই প্রথম রিদ্‌নিক্‌ আপন প্রাধান্য হারিয়ে এন্দ্রার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন হয়ে পড়ল। যে ডনজুয়ানএর আমরা ভাবতাম দাম্পত্যনীড়ে আবদ্ধ হওয়ার কোন সম্ভবনা নেই তার হয়ে গেল সম্বর বিবাহ।

মিয়েল্‌ দ্য লুন্‌ অর্থাৎ হ্যানিমুন উপভোগের যে সব নামজাদা রোমান্টিক জায়গায় নববিবাহিত দম্পতিরা গিয়ে থাকেন অর্থাভাবে সে রকম সফরের ব্যবস্থা না করতে পারলেও লক্সাঁবুর বাগানে বেড়িয়ে সেটা যে মনোরম ভাবে সারা যায় তার একটা জাজ্জ্বল্য উদাহরণ তারা দেখিয়ে দিল।

রিদনিকের একটিমাত্র কামরায় স্কিন্‌এর আবরু করে তাদের রন্ধনএর উপায় শয়নাগার ও আগত বন্ধুবান্ধবদের বসবার বৈঠকখানার ব্যবস্থা হয়ে গেল। ল্যাটিন কোয়াটারএর ছাত্র পল্লীতে এইরকম সংসারের বহু সংস্করণ চারিদিকে দেখা যায়। প্রয়োজনকে গুটিয়ে কতখানি ছোট করে যে মানুষ বাঁচতে পারে তার পরিচয় এই মিনিয়েচার্‌ সংসারগুলি। কিন্তু কষ্টের অভিব্যক্তির চেয়ে এখানে দেখা যাবে অনাবিল আনন্দের অফুরন্ত প্রবাহধারা। তা ছাড়া এন্দ্রার খেয়ালকে খুসী করতে ব্যস্ত থাকত রিদ্‌নিক্‌এর বিরাট বন্ধুবাহিনী কাজেই অভাব ও অভিযোগের সেখানে পা ফেলার কোন ঠাঁই ছিল না। মনে পড়ে এন্দ্রা সাড়ী পরে ফটো তোলার অনুরোধ করায় কত চেষ্টা করে পারীতে আগতা এক মারাঠী মেয়ের খোঁজ পেয়ে তাকে ডেকে বহু অনুনয়ে ও তার সাহায্যে সে সাধ মিটান হল।

পোল্যান্ড আক্রান্ত হলে ফ্রান্স যেই যুদ্ধ ঘোষণা করল স্বদেশ রক্ষার্থে উত্তেজিত রিদ্‌নিক সৈন্যদলভুক্ত হয়ে গেল ফ্রণ্টএ। এই মহাসংহারে মৃত আপনজনের যে দীর্ঘ তালিকা চিত্রগুপ্ত লিখতে শুরু করেছিলেন তার শীর্ষে প্রথম নাম লেখা হয়েছিল নিহত রিদ্‌নিক্‌এর।

এন্দ্রার ক্ষণজীবী আনন্দনীড়ে এই ভীষণ বিপর্য্যয়ের ঝড় কি রেখে গেল তা গিয়ে দেখবার মত সাহস আমার হয়নি।

এক ছিল কন্যা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

কার টাকা? ওর?

হ্যাঁ। চিঠিতে লিখেছে 'শোধ নিলাম। মাকে বলবেন যেন কাঁদে না। আর ফিরব না।'

অমল আর ফিরবে না। চুরী করে পালিয়েছে। এ সব কি শুনছে মৃগনয়নী। মৃগনয়নী চোখের সামনে পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে যায়। অমল চোর। অমল চুরী করেছে। আর কেন বেঁচে আছে মৃগনয়নী!

বলে ওঠে মৃগনয়নী,—ওকে পুলিসে দে খোকা। ওকে জেলে দে।

সে উপায় নেই। পুলিসে খবর দিলে নিজেদের বিপদ ডেকে আনতে হবে।

বলতে বলতে কমল দেখে মৃগনয়নী মেজের ওপর গড়িয়ে পড়ে গেছে।

মা!—কাছে গিয়ে দেখে জ্ঞান নেই।

এক গেলাস জল নিয়ে আসে কমল। মায়ের চোখে মুখে দেয়। কাবেরী একবার ওঠে না। নড়ে না। তেমনি চুপ করে বসে থাকে কঠিন হয়ে। চোখে মুখে জল দেবার পর জ্ঞান ফিরে আসে মৃগনয়নীর। কমলের দিকে তাকায় মৃগনয়নী। অমল চোর। চুরী করে পালিয়েছে। আর ফিরবে না।

আটাশ

বুকের ভেতরটা পুড়ে গেছে মৃগনয়নীর। পোড়বার সময় সে কি জ্বালা! পুড়েছ ত খাঁটি হতে হবে, নইলে আর উপায় কি বল না? ভেবে অবাক হচ্ছিলাম, সহোরও মানুষের সীমা আছে। কিন্তু মৃগনয়নীর সহোর সীমা দেখি না। কি আর করব বলো বাবা। এগুলো একএকটা পরীক্ষে বই ত নয়!—বলে হাসত মৃগনয়নী।

এরপর মৃগনয়নী আবার উঠল। আবার কাজ করল। শরীরটা শুধু শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। পোড়া কাঠের মত কালো। আর এলো না অমল। পুরো বিশটা দিন কেটে গেল। অমল এলো না। ভাত বাড়বার সময় দুখানা থালায় ভাত বেড়ে ভুল করে। বিছানা করবার সময় দুটো বালিস দেয় ভুল করে। পোড়া অভ্যেসই যত অনর্থ বাধায়। একটা নিশ্বাসও বড় করে ফেলে না মৃগনয়নী। চুপ করে কাজ করে যায়। ভাবে মনে মনে। এত বছর ধরে বুকের রক্ত দিয়ে কি ছাই সংসার গড়ে তুলেছিল মৃগনয়নী। সে মৃগনয়নী আর বেঁচে নেই। ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাচ্ছে ওর বাইরের সত্ত্বা। নবজন্ম হচ্ছে ওর। অন্তরে নতুন কার জীবন পাচ্ছে। সেখানে আর ক্ষয়ে যাবার ভয় নেই, মুছে যাবার আশংকা নেই। অমল যদি এখনি চলে যেত এতটা ভেঙে পড়ত না ও। অমল যে চুরী করে গেল। কি করে মেয়েটার কাছে মুখ দেখাবে ও।

—তুমি আমার ছোট না হলে পায় ধরতাম!

কাবেরী হাসে। পরমুহূর্তেই মুখখানা গম্ভীর করে বলে,—কি ছেলেই পেটে ধরেছিলেন মাসীমা!

—ঠিকই বলেছ মা। মাঝে মাঝে বসে বসে ভাবি, কেন এত ভোগ। ছোটবেলায় যদি

মরে যেতাম। কিন্তু তাহলে—।

তাহলে আজ যেখানে পৌঁছোচ্ছে ও, সেখানে পৌঁছতে আরও কত জন্ম কাটত। ভালই হয়েছে। যা হয়েছে, ভালই হয়েছে। কাবেরী ম্লান মুখে বলে,—আপনাকে যতই দেখছি ততই অবাক হচ্ছি মাসীমা।

—কেন?

—না। এমনি।

কাবেরী যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কে জানে। অনেকগুলো বছর আগে তার বাবা যে লোকটাকে বেঁধে মেরে বার করে দিয়েছিল। মুখ বুঁজে একটা কথা না বলে চলে গিয়েছিল লোকটা। বেশ মনে পড়ে চোখে তার জল ছিল। কিন্তু জ্বলা ছিল না। অমন ঠাণ্ডা নরম দৃষ্টি বহুকাল দেখেনি কাবেরী। আজ মৃগনয়নীর চোখদুটো কি সেই চোখদুটোই মনে করিয়ে দিচ্ছে? মনে আছে কাবেরীর লোকটা একখানা চিঠিও লিখেছিল তারপর, বিশ্বাস কর, তোমাকে বিয়ে করে যদি অন্যায় করে থাকি, সে অন্যায় ইচ্ছে করে করিনি।

সে কাহিনী যদি শুনতে চাও একদিন এসো। আমার ত যাবার উপায় নেই! যদিও অপরাধ ইচ্ছাকৃত নয়। তবু বার বার তোমার কাছে মাপ চাইছি। একবার এসো। সব শুনে যেও। একটি বার। ইতি তোমার হতভাগ্য স্বামী। চিঠিখানা ওর বাবা পড়ে দাঁতে দাঁত সিগারটা ধরিয়ে শুধু বলেছিলেন,—শুয়ারকা বাচ্চা! মা টানাটানা চোখদুটোয় এক রাশ বিষ এনে উচ্চারণ করলেন,—ঝাঁটা মারো! ওর রখন মাত্র ষোল বছর বয়েস। বাবা মায়ের কথাটাই কানে গেল। চিঠির অক্ষরগুলো অন্তর স্পর্শ করল না। চিঠিটা ছিঁড়ে উনুনে ফেলে দিল। এ পর্বের এখানেই শেষ। তবু এতবছর ধরে কাবেরীর বার বার মনে হয়, যদি সেদিন চিঠির উত্তরটা দিত! যদি একবার যেত সেখানে। কি তার কাহিনী, সেটাও না হয় শোনা যেত। কাহিনীটাও অব্যক্ত রয়ে গেল আজীবন। মৃগনয়নীর চোখদুটো বার বার ওকে চোখজোড়ার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। না। দুর্বলতাকে ও প্রশ্রয় দেবে। মণিমালার কঠোর বোঝাটা বুকের ওপর ঝাপিয়ে নেয়। মুখখানাকে অস্বাভাবিক গম্ভীর করে যায় ওপরে।

দিনের পর দিন কাটে। বোবা দিনগুলো কারোই অসহ্য লাগে না। ভালই লাগে। প্রথম দিককার উচ্ছ্বলতাকে সংযত করে নিয়েছে কাবেরী। ও বুঝেছে মৃগনয়নী ঠিক সে জাতের মেয়ে যাদের হেসে কথা বলে আয়ত্বে আনা যায়। বরং দিনের পর দিন মৃগনয়নীর ওপর ওর শ্রদ্ধা বেড়ে যায়।

কমল সেদিন মৃগনয়নীর দিকে তাকিয়ে বলে,—শরীরটা যে একেবারেই গেল মা!

হাসে মৃগনয়নী,—যাওয়াই ভাল।

সত্যিই ওর জেলো তাল শাঁসের মত চোখদুটোর দিকে তাকালে আজকাল ভয়ই করে। মনে হয় মৃতদেহের দুটো চোখ দেখছে।

—আচ্ছা! এক কাজ করো না মা!

—কি?

—জ্যাঠা মশায়ের বাড়ী গিয়ে থাক না?

—না। কাউকে আর জ্বালাতে চাই নে।—

—কিন্তু আমি ত' যে কোনদিন ধরা পড়তে পারি। তখন তোমার কি হবে?

—যা হয় হবে।

—বারে বা!

মৃগনয়নী আবার হাসে,—চিরটা কাল ত' তুই আমার ভাবনা ভাবিসনি। আজও না হয় নাই ভাবলি। যে ভাববার, ঠিক ভাববে।

কমল তবু বলে,—আমার মনে হয় তোমার কোন অসুখ হয়েছে। ডাক্তারের কাছে যাবে? চলো না কাল সকালে যাই।

—না, রে না। বিরক্ত করিস নি আমায়।

কমল আর কথা বলে না। সন্ধ্যের পর খাওয়া সেরে ও আর কাবেরী বেরিয়ে যায়। ফেরে অনেক রাতে মৃগনয়নী একা একাই জেগে বসে থাকে। ভালই লাগে। পরদিন ডাক্তারবাবুকে নিয়ে আসে কমল।

মৃগনয়নী খুব বিরক্ত হয়।

—তা হোক। আপনি একটু দেখুন মায়ের এমন চেহারা হচ্ছে কেন?

সেই ডাক্তার। যার বউ বীণা। এখন বেশ বুড়ো হয়ে পড়েছেন। অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করেন মৃগনয়নীকে।

—আপনার কি মাথা ঘোরে?

মাথা নাড়ে মৃগনয়নী,—হ্যাঁ। ঘোরে।

—শরীর খুব দুর্বল লাগে?

—হ্যাঁ।

—বুক ধড়ফড় করে।

—মাঝে মাঝে।

আর কোন কথা বলে না ডাক্তার। আবার পরীক্ষা করে বাইরে আসে। কমলকে রাস্তায় যেতে যেতে বলে—লো ব্লাড প্রেসার। এত লো যে যেকোন সময় হার্ট এ্যাটাক হতে পারে। এভাবে থাকা ঠিক নয়। ভাল খাওয়া দরকার। দুধ, ঘি, মাখন, প্রচুর ছানা। ওষুধ অবিশ্যি আমি দিচ্ছি। এসো আমার সঙ্গে। কমল যায় ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে আসে।

—ওষুধটা খেও মা। দুপুরে খাবার পর। রাত্তিরে খাবার পর। দুবেলা।

মৃগনয়নী বিরক্ত হয়ে তাকায়। ওষুধের শিশি মায়ের সামনে রেখে বাইরে চলে যায় কমল। দুধ ত' মা খাবে না। ঘি আনতে হবে আর রোজ সন্ধ্যায় বা রাত্রে যখন পারে কিছুটা ছানা আনবে। না খেলে ত' বাঁচবে না। ডাক্তার বলেই গেল। আরও টাকার দরকার। আর একটা ছেলে পড়াবার চেষ্টা করলে হয় কিন্তু সময় হাতে কখন? নিজের পড়ার ক্ষতি ত' হচ্ছেই। তার ওপর পার্টির কাজ। মায়ের এখন সে ছাড়া আর কেউ নেই। কে আর দেখবে মাকে। ভাবতে ভাবতে রাস্তায় চলে। আজ আবার সন্ধ্যার পর বেরোতে হবে। বিশেষ জরুরী কাজ। মণিমালাও সঙ্গে বেরোবে। ফিরতে রাত হবে অনেক। নিজেকে যেন ক্লান্ত মনে হয় কমলের। সাহেব মেরে আর পিস্তল বোমার ভয় দেখিয়ে যে কি হবে। তার চেয়ে যেন গান্ধীজীর কথা। গান্ধীজীর পথই ওর মনকে আকর্ষণ করছে বেশী। উপায় নেই। এখন আর উপায় নেই। যতদিন না এ দল আপনা-আপনি ভেঙে পড়ছে, ততদিন কিছুই করবার উপায় নেই আর। ফেরবার পথে বাজার সেরে একটু কি নিয়ে আসে কমলা একটা বড় ভাঁড়ে করে।

—এ কি ঘি কার?

—তোমার। একটু করে ঘি রোজ খাবে।

মৃগনয়নী হাসে। যেন অবাক হয়ে বলে,—আমি ঘি খাব?

হ্যাঁ। এটা যে তোমার ওষুধ।

মৃগনয়নী শুধুই হাসে। আর কথা বাড়ায় না।

সেদিন অনেক রাত্রে এসে শুয়েছিল ওরা। পরিশ্রম হয়েছিল খুব। শুয়ে পড়ে ওদের আর জ্ঞান ছিল না। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। মৃগনয়নী রাত্রে ঠায় বসেই ছিল। ঘুম আসে না। ঘুমোতে চায়ও না। শেষরাত্রে ও যেন শুনতে পেল বাড়ীর চারপাশে অনেক লোকের ফিসফিস কথা। কে এল? হয়ত ওর মনের ভুল। না। পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে অনেক-গুলো ভারী জুতোর আওয়াজ আর গলার ফিস ফিস শব্দ। যাকগে। যে আসে আসুক। চুপ করে বসে থাকে মৃগনয়নী। এই বারে একটু কাত হয়ে শোবে। নইলে কমল আবার সকালে উঠেই বলবে, কাল ভররাত নিশ্চয়ই ঘুমোওনি। কেন? কি হয়েছিল? ছেলেটা যেন ওর দিকে সব সময় নজর রেখেছে। কড়া নাড়ার শব্দ কাণে আসে। কে কড়া নাড়ছে এত ভোরে? আবার কড়া নাড়ছে। কাবেরী আর কমল ঘুমে বিভোর। ওদের কাণে কোন শব্দ যায় না। মৃগনয়নী উঠে জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে গলিটা লালে লাল। শুধু লাল পাগড়ীর ভীর। এত পুলিশ!

—ও খোকা। পুলিশ এসেছে। খোকা! ও খোকা!

ধড়মড় করে উঠে পড়ে কমল।

—পুলিশ!

জোরে একটা ধাক্কা মারে কাবেরীকে।

—পুলিশ!

কাবেরী উঠেই চোখ কচলে বলে,— তোমাদের ছাদ আছে? অন্য ছাদে টপকে যাওয়া যাবে?

—তা বোধহয় যাবে। চলো ছাদে।

কমল আর কাবেরী দু জনে প্রায় ছুটে বেরোয় বারান্দায়। ততক্ষণে দোর খুলে দিয়েছে কমলির মা। উঠোন থেকে শব্দ কাণে আসে।— দাঁড়ান, এক পা নড়বেন না আর। পিস্তলের মুখটা উঁচিয়ে ধরেছে একটি সাব-ইনস্পেক্টর। ওরা দাঁড়িয়ে পড়ে।

—পিস্তলটা বার করো কমল।— কাবেরী বলে।

কমল স্থির হয়ে গেছে বলে,—নেই। কাল ওটা পাচার করে এসেছি।

—শুধু হাতে ধরা দেব!

—উপায় কি।

ওপরে এসে গেছে একজন ইনস্পেক্টর আর একজন সাব ইনস্পেক্টর। পুলিশ কয়েকজন ওপরে আসছে। এসেই কমলের পকেট। কাবেরীর হাত সাড়ীর আঁচল সার্চ করে নেয়।

—সার্চ করব বাড়ী।

—করুন।— কমল বলে।

ওদের সামনে চারটে পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে। ঘরের বিছানাপত্র বাক্স ওলপ-পালট করে তছনছ করে দেয়। তখন ভোরের আলো দেখা দিয়েছে পূব আকাশে। জানলা দিয়ে আলো আসছে। মৃগনয়নী পাষাণের মত দাঁড়িয়ে আছে।

—আপনি কে?

মৃগনয়নী কেঁদে ওঠে।

—আমার মা।— বলে কমল।

ক্রমশঃ

স মা জ স ম স্যা

ছেলে চাই

শুধুমাত্র পাত্রপক্ষকে দোষারোপ ক'রে যদি আমাদের দেশের বিবাহরীতির ও পণপ্রথার হেরফের করা সম্ভবপর হত তবে 'সমকালীনে' পুনর্বার এই পর্যায়ের আলোচনা অত্যাবশ্যক ছিল না। শরৎচন্দ্রের দেশে এ সমস্যার ওপর নাটক নভেল ও আলোচনার কোনদিনই অভাব হয়নি। কিন্তু এপর্যন্ত যা হয়েছে তা শুধু সমস্যার চর্বিতচর্বণ। আমরা, পাছে সত্যের মুখোমুখী দাঁড়াতে হয় এই ভয়ে, পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব এড়িয়ে গেছি নিঃশব্দে।

লেখকের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা রেখেই বলতে বাধ্য হচ্ছি, শ্রীযুক্ত সোমেন বসু মহাশয় সেই পুরনো তর্কেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র। *কিন্তু স্বার্থের ক্ষেত্রে মানুষের চামড়া যে মনুষ্যেতর জীবের মতই কঠিন, এ সংবাদ অবগত থাকলে শ্রীযুক্ত বসু সমস্যাটিকে নিয়ে নিশ্চয় পণ্ডশ্রম করতেন না। শ্রীযুক্ত বসুর মত আমরাও সমস্যাটিকে বহুবার উত্তেজিত ভাবে উত্থাপন করেছি; কিন্তু স্বার্থ-সন্ধিৎসু মানুষের সামান্য একটি রোমকূপও স্পর্শ করতে পারিনি। তাঁর বক্তব্যের দ্বারা সমাজের কিছুমাত্র টনক-নড়া সম্ভবপর হলে বিশ শতকের শেষার্ধে এসেও 'ছেলে চাই' প্রবন্ধ রচনার আবশ্যক হতনা। এ সমস্যায় সমাধান যে পাত্রপ্রথাকে দোষারোপের মাধ্যমে অসম্ভব, বহুদিনের অভ্যাসে সেই কঠিন সত্য জানা গেছে। সুতরাং সমস্যাটিকে একবার উল্টোপিঠে ফেলে পুনর্বিচারের প্রয়োজন আছে। সেক্ষেত্রে মূল সমস্যায় গিয়ে উপনীত হওয়া বোধহয় সহজতর হবে।

এদেশে বিবাহের জন্য যে একটি বিশিষ্ট বাজার সৃষ্টি করা হয়েছে, বিবাহ-সম্পর্কিত সমস্ত সমস্যাই সেই বাজার-কেন্দ্রিক। এখানে আজও নরনারীর মানসিক মিলনটা সমাজবিরোধী, জৈবিক মিলনই সমাজ স্বাস্থ্যের অনুকূল। বিবাহপূর্ব মনের মিলন সর্বদাই অভিভাবককুলের চক্ষুশূল। এর কারণ, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, অভিভাবককুলের বাজার প্রীতি অথবা বাজার-সংস্কার। যেখানে অভিভাবকবর্গ দর কষাকষির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন, পুত্রকন্যা স্ব স্ব জীবনসঙ্গী বেছে নেন, সেখানেই 'গেল গেল' 'ধর ধর'রব। আর এই আর্তনাদ শুধুমাত্র পাত্রপক্ষেই যে আবদ্ধ নয়, একথা তর্ক করে প্রমাণ করার অপেক্ষা রাখেনা। সুতরাং বাজার টিঁকিয়ে রাখার স্বপক্ষে যে অভিভাবকমন ক্রিয়াশীল, তাকে সরিয়ে রেখে বিবাহসম্পর্কিত কোন কুপ্রথারই আলোচনা নিরপেক্ষ নয়। আগেই বলেছি, অভিভাবককুল অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বার্থের জন্যই এই কুপ্রথা টিঁকিয়ে রাখতে চান। এখন আলোচ্য, পণ দাতার ক্ষেত্রে যথার্থ স্বার্থ কোথায়।

অতএব সমস্যার পুনর্বিচারে উল্টোপিঠের আলোচনা প্রয়োজন। কন্যা বিবাহযোগ্যা। আসুন, একবার পাত্রীপক্ষের প্রাসাদে ঘুরে আসা যাক।

১নং ॥ কন্যাপক্ষ সম্প্রতি কিছু ব্যাঙ্ক ব্যালান্স করেছেন। কন্যা শিক্ষিতা কিন্তু শ্যামাঙ্গী; মুখে ঠোঁটে আলতা মাখেন, দুর্ভাগ্য, মুখশ্রী নিখুঁত নয়; গাড়ি গহনা রোজ পাল্টাতে হয়, কেননা সাজসজ্জায় রত থাকাই তাঁর একমাত্র দৈনিক কর্ম; সপ্তাহে দুটি সিনেমা, দিন দুই ঠাণ্ডা হাওয়াই

ব্যবস্থার রেস্তোরাঁয় কেতা শিক্ষা এবং বাকি দিন মোটর যোগে যতত্রত মুক্তবায়ু সেবন ও অনুষ্ঠান জলসাদিতে উপস্থিতি দিয়ে সামাজিক কর্তব্য পালন না করলে কন্যার জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়। এ হেন কন্যার জন্য পাত্রীপক্ষ মহা চিন্তিত। কন্যার জীবনে তাঁরা ভোগের আদর্শই রচনা করেছেন, অতএব ভোগে সুখে রাখতে পারে এমন পাত্র কন্যাপক্ষের একান্তই আবশ্যক। তাঁদের দাবি, পাত্র জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, খানদুই গাড়ির, খান চার বাড়ির ও মস্ত খেতাবের মালিক হওয়া চাইই। অন্যথা কন্যা বড়ই ক্লেশ ভোগ করবেন। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপা হল, পাত্রানুযায়ী লোভনীয় মূল্য উল্লেখ করা হল, দশদিকে ঘটক ঘটকি অবিশ্রাম ছুটোছুটি সুরু করল। বলা বাহুল্য চিত্তশালী কন্যাপক্ষের অভাব নেই। সুতরাং বাজারে কন্যাপক্ষের দর হাঁকাহাঁকি রীতিমত পাত্রবর্গকে 'অক্সন্' সেলে ডেকে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চলল।

২নং ॥ কন্যা বিবাহযোগ্যা। অবস্থা মোটামুটি। খাইয়ে পরিয়ে রাখবে এমন পাত্র চাই। তবে অধিকন্তু ন দোষায়। ইঞ্জিনীয়র, ফার্স্ট ক্লাশ অফিসর মিলে গেলে কন্যাপক্ষ 'কন্‌জিউমারস সারপলাস' বা ভোগবৃত্তির সৌভাগ্যে বিগলিত হবেন না, এমন কথা বলা গেল না। অতএব কন্যাপক্ষ বাজারে নামলেন। 'অক্সনে' একবার নিজের গৃহপালিতা দ্রব্যটির প্রদর্শনী দিতে ভুল করলেন না।

বাজার বসল, কম্পিটিশন সুরু হল, মূল্য হাঁকাহাঁকি উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করল। বাজারে পাত্রপক্ষ দরের ওঠানামা লক্ষ্য করতে লাগলেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা, "কিত্‌না ভাও!" কিন্তু এছাড়া পাত্রপক্ষই বা করেন কি। ছেলে মানুষ করতে কম করে কতটাকা ইন্‌ভেস্ট করতে হয়েছে একবার ভাবুন। দ্বিতীয়ত সহস্র কন্যাপক্ষ লোভী দৃষ্টি মেলে পাত্রপক্ষের দ্বারে এসে অনুগ্রহ প্রার্থী। এ হেন অবস্থায় পাত্র পক্ষের পক্ষে কন্যা বাছাই সমস্যা বৈকি। তাছাড়া অস্বীকার করে ফল কি যে আমরা মুনাফা শিকারীর দেশে বাস করছি। কন্যাপক্ষই যখন এই মূল্য ধরে দেওয়ার ব্যবস্থায় অগ্রণী, তখন পাত্রপক্ষের নির্লোভ সাধুতা আকাশ-কুসুম কল্পনামাত্র।

তথাপি পাত্রপক্ষ কন্যা বাছাই-এ বার হলেন। ২নং কন্যাকে মনে ধরল। অথচ ১ নম্বরের দল কন্যার খুঁতগুলি মোটা অঙ্কের অর্থে ঢেকে দিতে চান। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে মানুষ-বাছাই-এর প্রশ্ন অবান্তর। কেননা পাত্রপাত্রী সামগ্রী মাত্র। যোগাযোগকারী অপরে। এমন অবস্থায় মানুষটা তাই উপলক্ষ্য হয়ে পড়বেই। কিন্তু দু নম্বরকে নাকচ করতে হলে মানুষ হিসেবে পাত্রপক্ষই বা যুক্তি না সাজিয়ে যাবেন কোথায়! অতএব পাত্রী সকল তর্ক-বিতর্কের বাইরে এবং পাত্র রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যেই সম্পূর্ণ ভাগ্য নির্ভর হয়ে অপেক্ষা করতে পারেন। বিবাহে তাঁদের কোন ভূমিকা নেই।

অতএব প্রস্তাব এই যে, যে দেশে বিবাহের জন্য একটি নির্দিষ্ট বাজার আমরা সযত্নে লালন করে চলেছি, সে দেশের বিবাহে তর্কের ক্ষেত্রে কোন কুপ্রথা থাকতে পারে না। বাজার থাকলে সেখানে চাহিদা যোগানের ও প্রতিযোগিতার দাবি স্বীকার করে নিতেই হবে। খোলা বাজারে আইন করে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব, বক্তৃতা দিয়ে ও প্রবন্ধ রচনা করে ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে আত্মিক চেতনা সঞ্চারের প্রচেষ্টাও ফলপ্রসূ নয়।

তাই বিবাহঘটিত সমস্যা এদেশে যদি কোথাও থেকে থাকে তবে তার মূলে ঐ বিবাহ-বাজার। আর এই সমস্যায় সমাধান একমাত্র সম্ভব বাজারের বিলুপ্তি সাধনে; পাত্র পাত্রীকে স্ব

* ছেলে চাই ॥ সমকালীন ॥ আষাঢ়, '৬৬।

স্ব জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার মত অনুকূল সামাজিক আবহাওয়া সৃষ্টিতে। এপর্যন্ত আমরা বহুক্ষেত্রে দেখেছি, যেখানে মানুষের মূল্যকেই প্রাধান্য দিয়ে নরনারী উপযুক্ত জীবনসঙ্গী বেছে নিয়েছেন, সেখানে সাহস করে কোন বৈবাহিক কুপ্রথাই প্রবেশ-পথ পায়নি।

পাত্রপক্ষ যেমন পণ দাবি করেন বলে নিন্দার্হ, তেমনিই নিন্দার্হ কন্যাপক্ষ। একথা বিস্মৃত হলে চলবেনা যে, এই প্রতিযোগিতামূলক বিবাহ বাজারে এক শ্রেণীর বিত্তবান কন্যাপক্ষই আপন স্বার্থে পণপ্রথাকে জিইয়ে রাখার জন্য চেষ্টিত আছেন। পণপ্রথা উঠলে, অর্থাৎ আর্থিক প্রতিযোগিতার অবসান হয়ে কন্যারাই যদি তাঁদের গুণগত সম্পদ নিয়ে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণা হন তবে অনেক কন্যা পক্ষই অর্থের বিনিময়ে সুপাত্র কিনে নেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। অর্থ কৌলীন্য থাকা সত্ত্বেও কোন ধনবান জোতদার, জমিদার, ব্যবসাদার এমন সর্তে কখনই রাজি হবেন না বলেই বিশ্বাস।

সুতরাং সমস্যা বিবাহ-বাজারের এবং সমাধান বিবাহ-বাজারের নিরঙ্কুশ বিলুপ্তিতে। এ পর্যন্ত পাত্রপক্ষ ও কন্যাপক্ষকে গালি পেড়ে শুধুমাত্র মূল সমস্যাকে আমরা এড়িয়ে গেছি। বহুদিনের অভিজ্ঞতায় এই সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হচ্ছে যে, বক্তৃতা, প্রবন্ধ নীতি উপদেশ, নাটক, নভেল কিম্বা আইন প্রণয়নের দ্বারা এ সমস্যার সমাধান সহজ সাধ্য নয়।

বীরেন্দ্র মিত্র

সংস্কৃতি প্রসঙ্গ

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার

'জন্মিলে মরিতে হবে'—মানুষের জীবনে এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই। তাছাড়া বাইবেলোক্ত তিন কুড়ি দশ বছর পার করে গেছেন কাজেই তাঁর মৃত্যুতে বলার কিছু নেই; তবু তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ যাঁর মৃত্যু সবসময়েই অসময়ে মৃত্যু।

বাঙলা নাট্যশালার শতবর্ষপূর্ণ হয়ে গেছে। এই একশ বছরের মধ্যে তিনটি বিভিন্ন তরঙ্গ এসে বাংলার নাট্যপ্রবাহকে ধাক্কা দিয়েছে। প্রথম, নাটুকে রামানারায়ণও সুরু হয়ে মধুসূদনে শেষ হয়েছে। সে যুগ সাধারণের জন্যে নয় কিন্তু তবু সাধারণের জন্যে যাঁরা পরে এলেন তাঁদের আসার পথ দেখিয়েছিল, সেই যুগ। মাত্র ১৫।১৬ বছরের মধ্যে বাংলা নাটক শৈশব থেকে কৈশোরে এসে দাঁড়ালো। সেই কৈশোরকে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছে দিয়ে গেলেন নটগুরু গিরিশচন্দ্র আর তাঁর সহযোগীরা। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যশালারও যেন অন্তিম দশা এসে দাঁড়ালো। বাঙলা দেশে বিদগ্ধ বাঙালীর নাট্যশালা অপাঙ্ক্তেয় হয়ে পড়লো।।

সেই যুগ সন্ধিক্ষণে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের আবির্ভাব। তিনিই তোষাখানাকে বৈঠকখানা বানিয়ে দিলেন। বাঙলা নাট্যশালা মরতে মরতে নবীন যৌবনের তেজে উঠে দাঁড়ালো। তারপর প্রায় চল্লিশ বছর ধরে নানাভাবে নাট্যশালাকে তিনি এগিয়ে নিয়ে যেতেই চেষ্টা করেছেন। কতটুকু সক্ষম হয়েছেন সে বিচারের জায়গা এটা নয় বা এখনও নয়। পর্বতের কাছে থাকলে তার উচ্চতা বিচার করা সম্ভব নয়। বাঙলা নাট্যশালায় শিশিরকুমারের অবদানের বিচার করবে ভাবীকাল, সে বিচার আমাদের হাতে নয়। যদিও বিচারের জয়মাল্য যে তাঁর দিকেই পড়বে সে বিশ্বাস আমাদের আছে, তবু আজ নট বা নাট্য প্রযোজক শিশিরকুমারের কথা বলবনা, বলব মানুষ শিশিরকুমারের কথা আর তারই আনুষঙ্গিক হিসাবে নাট্যাচার্যের কথা।

শিশিরকুমারের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি অল্পদিনের। আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও ছিলনা—অবশ্য থাকা সম্ভবপরও নয়, কারণ আমাদের বয়সের তফাৎ এমন ছিল যে একটা দূরত্ব থাকতই। তবু আমার মত সাধারণ মানুষকেও তিনি যা স্নেহ করেছেন তা অকল্পনীয়। দিনের পর দিন তাঁর পাশে বসে তাঁর অতুলনীয় কন্ঠে নাটক পড়া শুনেছি, আবৃত্তি শুনেছি। অত্যন্ত কাছ থেকে নূতন নাটকে অজানা অচেনা লোকেদের অদম্য উৎসাহে তালিম দিতে দেখেছি। কথায় বলে, ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার। কিন্তু সত্যিকারের সর্দার হলে যে ঢাল তলোয়ার না থাকলেও চলে তার প্রমাণ নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের মধ্যে দেখেছি।

শিশিরকুমারের মধ্যে যে প্রচন্ড প্রতিভা ছিল সে তার উপযুক্ত প্রকাশের অবকাশ পেলোনা এ শুধু তাঁর দুর্ভাগ্য নয়, আমাদের সকলকার এমন কি দেশেরও দুর্ভাগ্য। তিনি অবশ্য নিজের দুর্ভাগ্যের কথাই বলতেন। একেবারে শেষ যেদিন বরানগর থেকে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে আসছিলেন সেদিন গাড়ীতে আমায় বলেছিলেন—মঙ্গল অষ্টমে যার, রন্ধ্রগত শনি কে দেয় অনলে হাত কে ধরিবে ফণী। ঐ শনি মঙ্গলের গোলমালেই আমার কিছু হলনা হে। আমার এক আত্মীয় বলেছিলেন—ধন, মান সব তোমার হবে কিন্তু রাখতে পারবেনা কিছুই। হলওত তাই।

আর একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন—'হাজার বছরে এমন একজন লোক জন্মায় যার জন্য দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র পথ চেয়ে থাকে; সবাই তার পথ করে দেয়। সে সৌভাগ্য আমার নয়।' তিনি অবশ্য অনেক দুঃখে বলেছিলেন, কিন্তু তাতেও আর আমাদের দোষক্ষালন হবে না। কাগজে দেখলাম, তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ হবার কথা হচ্ছে। সত্যি কি বিচিত্র এই দেশ!

তিনি রোজ বলতেন—'আমাকে একটা বাড়ী দাও, আর কিছু ছেলে মেয়ে দাও; ক বছর আর বাঁচব কিছু একটা করি।' অথচ কেউ কিছু করল না। না কেউ কিছু করল না বলা অন্যায় হবে, তাঁর মুখেই শুনেছি কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর আর সাহিত্যিক-রাজনৈতিক সৌম্যেন্দ্রনাথ তাঁর জন্য থিয়েটারের ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রায় একবছরের মধ্যে প্রচেষ্টাটি বাস্তবে রূপান্তরিত হলনা। তবু তাঁর স্মৃতি যদি একটি জাতীয় নাট্যশালা করে রক্ষা করা হয় 'ত তাঁর স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখানো হয়।

শিশিরকুমারকে বলা হ'ত দাম্ভিক। প্রতিভার একটা দম্ভ থাকেই কিন্তু শিশিরকুমারের দম্ভ শুধুই প্রতিভার দম্ভ নয় তার মধ্যে সূক্ষ্ম অভিমানও ছিল। বারবার তাঁকে বলতে শুনেছি দেশ তাঁকে তাঁর উপযুক্ত মূল্য দেয়নি। একথা থেকে তিনি কখনো বোঝাতে চাননি যে, দর্শক সাধারণ তাঁর অভিনয়ের মূল্য দেয়নি। বরং তিনি বলেছেন এবং কিছুদিন আগে একটি প্রবন্ধেও লিখেছেন—সাধারণ মানুষকে যখন যা ভালো দিয়েছি তারা সাদরে তা নিয়েছে। তবে অভিমান ছিল কাদের ওপর?

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্র ও সু-অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাদুড়ি আশুতোষের অনুরোধ উপেক্ষা করে যেদিন নাট্যশালার উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করলেন তখন থেকেই তাঁর সমসমাজ অর্থাৎ বিদগ্ধ জনসমাজের কাছে ব্রাত্য হয়ে গেলেন। তাঁর সৃষ্টির প্রচেষ্টায় বিশেষ কোন সাহায্যই তিনি বন্ধু বা পরিচিত মহল থেকে পাননি। তাছাড়াও সে সময়ের সংবাদপত্রে তাঁর অভিনয়ের কোন আলোচনা তিনি দেখেন নি ঃ এমন কি অনেক ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ পক্ষীয় অভিনেতাদের প্ররোচনায় তাঁর কুৎসাই করা হয়েছে।—অন্ততঃ তাঁর ধারণা ছিল এই রকম। আর সেই জন্যই তাঁর অভিমানকে দম্ভের সঙ্গে মিলিয়ে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন তিনি।

প্রতিভাধর ব্যক্তিমাত্রই অল্পবিস্তর গর্বিত হন, শিশিরকুমারের মধ্যেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু গর্বিত হলেও তিনি আত্মম্ভরী ছিলেন না। বহুবার তাঁকে বলতে শুনেছি, গিরিশবাবু আমার চেয়ে অনেক বড় অভিনেতা ছিলেন। অর্দ্ধেন্দু মুস্তাফি, অমৃত মিত্র আর অমৃত বোসেরও অভিনয় গুণের প্রশংসা বহুবার করেছেন, এমন কি এ পর্যন্ত বলেছেন—সে যুগের বহু সাধারণ অভিনেতা আমাদের যুগের দুচার জন বড় অভিনেতা ছাড়া সকলের চেয়ে বড়। দানীবাবুর অভিনয় কলার সম্পূর্ণ বিপরীত রীতির প্রবর্তন করলেও তাঁর কন্ঠস্বরের অকুণ্ঠ প্রশংসা করে বলতেন—অমন দেব দুর্লভকন্ঠ আমি শুনিনি। ওরকম গলা যদি আমি পেতাম'ত অনেক কিছু করতে পারতাম।

শিশিরকুমার সম্বন্ধে দুর্ণাম শুনেছিলাম, অপরের প্রতিষ্ঠা তিনি সইতে পারেন না কিন্তু তাঁর পূর্বসূরীদের প্রতিষ্ঠা তিনি বাড়িয়েই যাবার চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে তাঁর সমসাময়িক কালের লোকেদের বিশেষ করে নটনাট্যকারদের যেখানে প্রশংসা করা সম্ভব সেখানে প্রশংসা করেছেন, যেখানে সম্ভব হয়নি সেখানে বলেছেন—আমার কাছে ওকথা জানতে চেয়োনা। বহু প্রাচীন অভিনেত্রীর সম্বন্ধে তাঁকে ভূয়সী প্রশংসা করতে শুনেছি। তিনকড়ি বা তারার অভিনয় প্রতিভার কথা পঞ্চমুখে বলে শেষ করতে পারতেন না। কুসুমকুমারীরও প্রশংসা করতেন, বলতেন—অতবড় শরীর নিয়ে নাচত অথচ একটু আওয়াজও হোতোনা। চারুশীলার

অভিনয় ক্ষমতারও প্রশংসা করেছেন তিনি। কিন্তু সবচেয়ে প্রশংসা করেছেন প্রভার; বলেছেন—অন্য দেশে হলে ওর প্রতিভার দাম পেতো। একবার কি একটা প্রহসনে প্রভা একটি গেঁয়ো মেয়ের ভূমিকা নাকি অপূর্ব করেছিলেন। তারই দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছিলেন—'ঠিক গেঁয়ো মেয়ে কোনরকমে ধরবার উপায় নেই। অথচ বাইরে যখন অভিনয় করতে গেছে তখন কিছুক্ষণের জন্য ছাড়া ও-তো পল্লীগ্রাম দেখেই নি। এই হল সত্যিকারের বড় অভিনেত্রী।'

শিশিরকুমারের সবচেয়ে বড় দুঃখ ছিল যে একজন ভাল নাট্যকার তিনি তাঁর সঙ্গী পেলেন না। দুজনকে তিনি পেয়েছিলেন যাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সম্ভাবনা তিনি দেখেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পারিপার্শ্বিকের চাপে তাঁদের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ ঘটলনা।

দুজনের একজন—রবীন্দ্রনাথ। শিশিরকুমার বলতেন—রবীন্দ্রনাথ মনে করলে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হতে পারতেন। কিন্তু থিয়েটারের লোকেদের সঙ্গে ভাল করে মিশতে পারলেন না। মেশার অবশ্য চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তখনকার দিনের থিয়েটার ঠিক মেশার অনুকূল ছিলনা। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথও সহজেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়তেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে না মিশতে পারুন, মানুষ ঠিক চিনতে পেরেছিলেন, তাই পরিষ্কার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁর নাটকের প্রয়োগের দায়িত্ব তিনি শিশিরকুমারকেই দিয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ শিশিরকুমারের প্রতিভাকে এতটাই সমাদর করতেন যে, তাঁর নির্দেশিমত তপতীর পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। কথাটা আশ্চর্য মনে হলেও সত্য আর তার প্রমাণ তপতীর প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ মিলিয়ে দেখলেই পাওয়া যাবে। আর সবচেয়ে বড় প্রমাণ দেখেছি শিশিরকুমারের কাছে—রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে সংশোধন করা তপতী নাটক।

দ্বিতীয় যে নাট্যকারের কথা শিশিরকুমার বলতেন তাঁকে বাংলা দেশ আজ ভুলে যেতে বসেছে। যদি বা কেউ মনে রাখেন, তাও নাক সিঁটকে ঠোঁট উলটে—স্যাষ্টি সেকেলে বলে। ক্ষীরোদ প্রসাদের সম্বন্ধে এরকম ধারণার কারণ তাঁর অধিকাংশ নাটকই পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক। একটি মানুষ তার যুগকে অতিক্রম করতে পারে না, তাই ক্ষীরোদপ্রসাদও তাঁর যুগের প্রভাবে পৌরাণিক আর ঐতিহাসিক নাটকই বেশী রচনা করেছেন। কিন্তু তাতেও তাঁর নাট্যকারত্ব খর্ব হয়নি।

অথচ নিতান্ত সামান্য কারণে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিশ্ববিশ্রুত নাট্যকার হতে পারলেন না। শিশিরকুমারের নিজের ভাষাতেই বলি— ক্ষীরোদদাকে তারা বোঝালে তুমি একজন এতবড় নাট্যকার তুমি কিনা ভেড়ের ভেড়ে শিশির ভাদুড়ির কথায় লেখা কাটাকুটি করবে, বদলাবে। মজার কথা এই যে, শিশিরকুমার-প্রস্তাবিত সংশোধন করার ফলেই ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক মঞ্চ সফল হয়েছিল। নাটক পড়ার সময়েও দেখেছি ছাপানো নাটক আর অভিনয়ের 'পাঠে'র আকাশ পাতাল তফাৎ। সব সময় শেষেরটিই ভাল লেগেছে।

পূর্বসূরীদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ও মধুসূদনের নাটকের খুব প্রশংসা করতেন তিনি। তবে বলতেন প্রয়োজনের তাগিদে গিরিশচন্দ্র বহু খারাপ (নাটকীয়তার দিকে থেকে) নাটকও লিখেছেন। বর্তমান যুগের অধিকাংশ নাট্যকার সম্বন্ধে তিনি কিছু বলতে চাননি, তবে আভাস যা পেয়েছি তাতে মনে হয় বিরূপ ধারণাই ছিল তাঁর। নিজে তিনি কিন্তু নাটক লেখেন নি, অবশ্য তাঁর অভিনীত প্রায় সব নাটকেই তিনি যে পরিমার্জন করেছেন সে ছাপ সুস্পষ্ট। তবু কেন নাটক লেখেননি এ প্রশ্ন করাতে বলেছিলেন 'দেখ, নাটক লেখা আমার কাজ নয়। আমি অভিনয় করতে পারি, শেখাতে পারি, বোঝাতে পারি কিন্তু নাটক লেখা আমার পক্ষে হবে অনধিকার চর্চা। গিরিশবাবু কখনো ভাবেননি, কিন্তু তবু তাঁকে লিখতে হয়েছিল। তার ফল খুব ভাল হয়নি ও

ভুল আর আমি করবনা'। তরুণ নাট্যকারদের নাটক লিখতে সাহায্য করতে তিনি সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন।

নাট্যাচার্য হিসাবে শিশিরকুমার ছিলেন অদ্বিতীয়। স্বাভাবিক ভাবে কথা বলার ভঙ্গী বাঙলা নাট্যশালায় তিনিই প্রচলন করেন। আজকের নবনাট্য আন্দোলনের সূত্রপাতও সেখানেই। কিন্তু রীতি প্রবর্তন করা যত সহজ, প্রচলন ততটা নয়। তার জন্য প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রমের। যৌবনকালে সে পরিশ্রম তিনি করেছেন, এমন কি সত্তর অতিক্রান্ত অথর্ব বৃদ্ধকেও দেখেছি শেখানোর উৎসাহে শরীরের পঙ্গুত্ব ভুলে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা তালিম দেওয়াচ্ছেন। এবিষয়ে তিনি অর্ধেন্দুকুমারের উত্তরসূরী। তিনিই বলেছেন—'গিরিশবাবু শেখানোর দিকে বিশেষ জোর দিতেন না। দুএকবার বলিয়েই বলতেন—বাঃ বেশ বলেছিস বাবা, বেশ বলেছিস। তোদের বয়সে ওরকম আমিও পারতাম না। তা এক কাজ করিস, সময়ে এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বলিস। অর্ধেন্দু কুমার কিন্তু ঘন্টার পর ঘন্টা শেখাতেন, যতক্ষণ না নিখুঁত হয়।'

এই নিখুঁত করার চেষ্টা ছিল বলেই দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেও উপযুক্ত একটা গোষ্ঠি তিনি গড়ে তুলতে পারেন নি। তাঁর ধারণা ছিল আরভিংএর মত অন্তত ১০।১২ বছর শিক্ষানবিশী না করলে অভিনয় শেখা যায় না। কিন্তু আজকালকার দিনে কে অত সময় দেবে। একদিন তাঁর সঙ্গে অভিনয় করার পর যদি নায়ক হওয়া যায়, দু তিন মাস কাজ করলে যদি পরিচালক হওয়া যায়, একবছর থাকার পর যদি শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হওয়া যায় ত ১০।১২ বছর থাকে কোন গর্দ্দভ?

তাই হাজার চেষ্টাতেও উপযুক্ত শিষ্য তিনি পাননি। অবশ্য শিষ্য পাওয়াও কঠিন, কথাই আছে—গুরু মিলেত লাখো লাখো, চেলা মিলেত এক। যে দু একজনের মধ্যে সে সম্ভাবনা ছিল তাঁর জীবিতকালেই তাঁরাও গত হয়েছেন। তাই শিশিরকুমারের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর যুগের অবসান বোধ হয় সূচিত হল। পুরোতন বিদায় নেয় আসে নূতন—প্রকৃতির এই ধর্ম। কিন্তু তবু স্বর্ণময়ী অতীতের কথা স্মরণ করে দীর্ঘশ্বাস পড়ে বৈকি!

কবির ভাষায় শিশিরকুমারকে বলা যায়—অপরূপ তুমি ললিতে কঠোরে। দীর্ঘ দিন তিনি অভিনয় করতে করতে অভিনীত বহু চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। তাই তাঁর চরিত্রে বহু বিচিত্র বিভিন্ন চরিত্রের সংমিশ্রন দেখা যায়। ভ্রাতৃবাৎসল্যে তিনি রাম আবার তিনি বন্দী সাজাহান; তিনি স্বপ্নবিলাসী ব্যর্থকাম মাইকেল আবার খণ্ডিতগর্ব ভীষণ ভীল রঘুয়া। তিনি শকুনো সাজানো বাগানের মালিক যোগেশ; তিনি একনিষ্ঠ ভীষ্ম আবার দৈবপীড়িত হতভাগ্য কর্ণ; তিনি শাহেন শা আলমগীর আবার তিনি জাহান্দার; তিনি প্রবীর আবার নাদির; তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ন্যায় শয়ান ভীম আবার ভবিষ্যত অমঙ্গলের বাহক ব্রাহ্মণ।

দোষগুণ নিয়ে মানুষ, কিন্তু শিশিরকুমারের গর্বই যদি দোষ হয় ত,

একহি দোষা গুণ সন্নিপাতে
নিমজ্জিতন্দু কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।

শিশিরকুমারের নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছে কিন্তু তিনি অমর হয়ে রইলেন। যতদিন বাঙলাদেশে একজন বাঙালী থাকবে, যতদিন বাঙলার মঞ্চশালা থাকবে, একজনও রসিক লোক থাকবে ততদিন শিশিরকুমার উপকথার মত বেঁচে থাকবেন।

রবি মিত্র

স মা লো চ না

Ragas and Raginis—Amiya Nath Sanyal. Published by Orient Longmans—Price Rs. 5/-.

ভারতীয় সঙ্গীতের তত্ত্ব বা থিয়োরী ভরত, মতঙ্গ, নারদ ইত্যাদি মুনিরা যে গবেষণা তাঁদের পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন এপর্যন্ত তাঁদের থেকে নতুন কথা আমরা শুনিনি। অপেক্ষাকৃত পরে তাঁদের টিকাকারেরা সেই তত্ত্বের অর্থ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি করবার সুযোগ দিয়েছেন। তাই প্রতিভাশালী সঙ্গীতকারের বা যুগপরিবর্তনের ফলে, নূতন শিল্পবোধ, যখনই নূতনতর পদ্ধতিতে সঙ্গীতসৃষ্টি করতে গেছে তখনই বিদ্রোহী আখ্যায় ভূষিত হয়েছে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে খ্যাতনামা ভারতীয় সঙ্গীত-শিল্পীরা লেখনী চালনায় তেমন পটু ছিলেন না। কাজেই মুনিদের লেখা তত্ত্ব বিচারে সংস্কৃত পণ্ডিতদের ও সাহিত্যিকদের পাণ্ডিত্যের ছাপ পড়ল। প্রয়োগ শিল্পের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তার মূল্যায়নের ভিত্তি বোধকরি সেইজন্যেই বিপথগামী হয়েছে। শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল মহাশয় তাই নূতন করে ভারতীয় সঙ্গীত মূল্যায়নে ব্রতী হয়েছেন। তিনি প্রথমতঃ মুনিদের প্রামাণ্য গ্রন্থ নাট্যশাস্ত্র বৃহদ্দেশী ইত্যাদি থেকে বক্তব্যগুলি উদ্ধার করে ভ্রমাত্মক প্রচলিত মতবাদগুলির খণ্ডন করেছেন। তাঁর গুরু প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবেত্তা শ্রীশ্যামলাল ক্ষেত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহ লাভ করেছেন ও বদল খাঁ প্রমুখ খ্যাতনামা প্রয়োগ শিল্পীদের দীর্ঘকালের সাহচার্য তাঁকে অমূল্য সুযোগ যুগিয়েছে।

অমিয় বাবুর শিল্পীমনের পরিচয় আমরা এর আগেই পেয়েছি। এই বইখানি তাঁর চুলচেরা বিশ্লেষণী বৃত্তি ও সংস্কার নির্মুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছে। তাঁর গবেষণার মূলে রয়েছে ভারতীয় রাগ রাগিণীর তত্ত্ব সন্ধান। এর জন্য তিনি পরিসংখ্যান নীতি বেছে নিয়েছেন। অঙ্কের হিসাবে সঙ্গীতের মূল্যায়নে যাঁদের এতদিন আপত্তি ছিল বইখানি পড়লে বোধকরি সেই গোঁড়ামী দূর হবে। আসলে এটাও প্রমাণিত হল যে পরিসংখ্যান এমনই একটি পদ্ধতি যার যথার্থপ্রয়োগে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সব সময়েই সম্ভব। অমিয় বাবুর বিজ্ঞানী মন তাই শিল্পরসকে বাহত না করেও পরিসংখ্যানকে কাজে লাগাতে সমর্থ হয়েছে।

ভারতীয় সঙ্গীতে স্বরগুচ্ছ বিশেষের প্রয়োগবহুলতা রাগ রাগিণীকে চিহ্নিত করে। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে অমিয় বাবু বিভিন্ন সঙ্গীতকে বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম হল গীতকর্মের নমুনা সংগ্রহ করে তার একটি নির্লেখ বা চার্ট তৈরী করা। দ্বিতীয়তঃ শ্রেণীবিভাগ করে তার বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

পরিসংখ্যান নীতির প্রধান কাজ হল যথার্থ প্রতিনিধিমূলক নমুনা সংগ্রহ। বিষয় বস্তুর প্রতি সহৃদয় দৃষ্টি রেখে অমিয় বাবু নমুনা সংগ্রহ করেছেন এক বিস্তৃত ক্ষেত্রে থেকে। সঙ্গীত মঞ্জরী, মারিফ-উন-নগমৎ, ক্রমিক পুস্তক মালিকা, যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা ইত্যাদি স্বরলিপির বই থেকে সুরু করে অতুলপ্রসাদ এবং বহুল প্রচারিত বাংলার তথাকথিত লোকসঙ্গীতগুলিকে

নিয়ে তাঁর এই ক্ষেত্রের বিস্তৃতি। গানগুলি যে কোনও সুরের বৈচিত্রের নমুনা হিসাবে অতুলনীয়।

কিন্তু বইখানির সবচেয়ে বড় দুটি বৈশিষ্ট্য হল বিশ্লেষণের যুক্তি ও সেই থেকে উপনীত সিদ্ধান্তগুলি। ভারতীয় সঙ্গীতে গানের নমুনা থেকে রাগ রাগিনীর রূপ নির্দ্ধারণ করার পদ্ধতি চিরাচরিত। এই নির্দ্ধারণ তত্ত্বের বিকল্পেই বিভিন্ন মতবাদ ও "ঘরাণার" সৃষ্টি হয়েছে। অমিয় বাবুর বিশ্লেষণে এই নির্দ্ধারণ তত্ত্বের কয়েকটি ভুল ধরা পড়েছে। তিনি প্রমাণ করেছেন যে প্রচলিত পদ্ধতি মত বাদী সম্বাদী বিচার, আরোহী অবরোহীর ক্রম বা পকড়ের বিন্যাস, রাগ রাগিণীর তত্ত্ব স্থাপনায় আংশিক ভাবে সক্ষম। তাই শ্যামলালজী নির্দেশিত মেরু, খণ্ডমেরু ও মাতৃকা এই তিনটি শব্দের মাধ্যমে ভারতীয় সঙ্গীত বিচারের যাথার্থ্য প্রমাণ করেছেন।

মেরু কথাটি একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের পরিমাপ জ্ঞাপক। তিনটি সপ্তকের বিস্তৃতিতে প্রত্যেক সপ্তকের শুদ্ধ ও বিকৃত বারটি স্বরের ক্রমিক অবস্থানের ফলে স্বরাদির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সেই সম্বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে যে কোনও বারটি স্বর নিয়ে সঙ্গীতে মেরুর পরিকল্পনা। মেরুর খণ্ডবিশেষকে বলা হয় খণ্ডমেরু। সুতরাং বোঝাগেল যে এই বিচার পদ্ধতিতে স্বরবিন্যাস অপেক্ষা স্বরসম্বাদের উপর দায়িত্ব পড়েছে বেশী। মাতৃকা হল কোনও রাগ রাগিনীর স্বরগোষ্ঠীর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন পরিকল্পনার আদি জঠর। অর্থাৎ মাতৃকা হল চারটি স্বরের একটি গুচ্ছ যার মধ্যে দুটি সম্বাদী ও তিনটি অনুবাদী স্বর সম্বন্ধ বর্তমান। যেমন সজ্জপণি, সগপনি ইত্যাদি। যে কোনও রাগ রাগিণীর একাধিক মাতৃকা থাকা সম্ভব কিন্তু মাতৃকা স্বরগুচ্ছের সমষ্টিগত প্রয়োগ বাহুল্য রাগ রাগিণীর বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারণ করে। শ্যামলালজীর এই বক্তব্যটুকু অমিয় বাবু নমুনা বিশ্লেষণ করে একদিকে যেমনি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন অন্যদিকে এই পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গীত বিশ্লেষণও সার্থক হয়েছে। প্রত্যেকটি বিশ্লেষণের পরই অমিয় বাবু কয়েকটি করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এই সিদ্ধান্তগুলি চমকপ্রদ। ভারতীয় সঙ্গীত তত্ত্বের, এবং বিশেষ করে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের সঙ্গীত চিন্তাধারার আংশিক মতবিরোধী হলেও অখণ্ডনীয় যুক্তির মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। কয়েকটি সিদ্ধান্তের পরিচয় দিই।

১। প্রাচীন শাস্ত্রকার নির্দ্ধারিত রাগ রাগিণীর মধ্যে স্ত্রীপুরুষ ভেদ কল্পিত বা মনগড়া নয়। মাতৃকা স্বরগুচ্ছের দুটি সম্বাদী সম্বন্ধ আলাদা করলে দুটি খণ্ডমেরু হয়। যেমন সজ্জপণি ও সগপনি মাতৃকা দুটির খণ্ডমেরুগুলি হল সজ্জপ, জ্ঞপণি ও সগপ, গপনি। এই দুটির যোগাযোগে বা মিথুনে মাতৃকার উৎপত্তি। এই খণ্ডমেরুগুলিকে ধ্বনি সৌন্দর্য্যের তারতম্যে পুরুষ ও স্ত্রী এই দুইভাগে সাজানো যায়। ইংরাজীতে বলা হয় যথাক্রমে major o minor chord. কোনও সঙ্গীত ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রধান মাতৃকার মধ্যে স্ত্রী বা পুরুষ খণ্ডমেরুর প্রয়োগ বাহুল্য সেই রাগরাগিণীর স্ত্রী বা পুরুষ নামকরণের জন্য দায়ী। তাই কল্যাণ বা কল্যাণী ভূপাল, ভূপ বা ভূপালী, খাম্বাজ বা খাম্বাবতী প্রভৃতি রাগ রাগিণীর নামের যৌক্তিকতা। নামগুলি কোনকালেই আকস্মিক ভাবে আসেনি।

২। সঙ্গীতের তত্ত্বগুলি সবই সার্বজনীন। সেখানে আপাত দৃষ্টিতে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সঙ্গীত পৃথক বলে মনে হলেও মূলতঃ একই। তাদের সঙ্গীতক্রিয়ার প্রতিটি প্রয়োজনার পেছনে একটি করে নাম দেওয়া থাকলেও Sunset on the Rhine বা moonlight Sonata-র পেছনে "in C major" বা "in C minor" কথাগুলি জুড়ে দেওয়া ভারতীয় পরিকল্পনার গোষ্ঠীভুক্ত নামকরণের সামিল। থিয়োরী অব্ অটোনালিটি বা স্বর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন স্বর সপ্তকের দ্বারা প্রভাবান্বিত আধুনিক ইউরোপীয় সঙ্গীতচিন্তার বিপক্ষে মরিস সাহেবের যুক্তি ও ভার-

তীয় সঙ্গীতের স্বরসম্বন্ধ মতবাদের অনুরূপ। অমিয় বাবু ইউরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের তফাৎ দেখিয়েছেন প্রয়োগের ক্ষেত্রে। সেখানে স্বরের সম্বাদীসম্বন্ধ ও স্ত্রী পুরুষ খণ্ডমেরুর স্বীকৃতি থাকলেও মিথুনের পরিকল্পনা না থাকায় মাতৃকা স্বরগুচ্ছ গড়ে উঠতে পারেনি। তাই রাগ রাগিণীর জন্মও সম্ভব হয়নি।

৩। কোনও রাগ রাগিণীর একটি মাত্র বাদীস্বর নয়,—প্রধান মাতৃকা স্বরগুচ্ছের দুইটি খণ্ডমেরুর মধ্যে প্রধান খণ্ডমেরুটির তিনটি স্বরের যে কোনটির পক্ষেই হওয়া সম্ভব। এমনকি বিবাদীস্বর বা 'নিউট্রাল নোট'ও বাদীস্বরের স্থান গ্রহণে সক্ষম। সঙ্গীত কর্মের প্রয়োগশিল্পের উপরই সেটা নির্ভরশীল। তেমনি "পকড়," রাগ রাগিণীকে চিহ্নিত করবার নির্ভুল উপায় নয়। স্বরের বিন্যাসে পকড়ের সৃষ্টি এবং সেই বিন্যাস শিল্পীর প্রয়োগেচ্ছানুগত। আরোহী অবরোহী, রাগ রাগিণীর পরিচয়ে নয়, মূর্চ্ছনায় পরিচয়ে ভরত মুনি ব্যবহার করেছিলেন।

৪। রাগ রাগিণীর জাতি বিভাগে জনক জন্য মেল বা ঠাট বা উড়ব-ষাড়ব-সম্পূর্ণ ইত্যাদি পরিচয়ের কোনও স্থান নেই। শেষোক্ত জাতি বিভাগের রীতি ভরতমুনি ব্যবহার করেছিলেন মূর্চ্ছনার জাতি বিভাগের জন্য, রাগ রাগিনীর জন্য নয়।

৫। রাগ রাগিণী অসংখ্য হওয়া সম্ভব কিন্তু সাধারণতঃ কোনও এক সময়ে একশ কুড়িটির বেশী রাগ রাগিণীর প্রচলন হয়না।

এই ধরণের আরও অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এই বইখানিতে কিন্তু বোধকরি তার মধ্যে সবচেয়ে বড় একটি সিদ্ধান্ত হল Rule of two fifth. অধুনা ভারতীয় সঙ্গীতে রাগ রাগিণীর বিভিন্ন মিশ্রণ নিয়ে পরীক্ষা চলছে। নির্দিষ্ট আরোহী অবরোহীর স্বরগুলি ছাড়াও রাগ-রাগিনীতে অন্য কোন স্বরের ব্যবহার ওস্তাদী মতে রাগের বিচ্যুতি ঘটায়। অমিয় বাবু খ্যাতনামা সঙ্গীতশিল্পীদের বিভিন্ন রাগ রাগিণীর পরিবেশন ক্ষেত্রে এই ধরনের বিভিন্ন স্বরের ব্যবহারগুলি তুলে ধরে দেখিয়েছেন যে তাতে রাগরূপের বিশেষ ক্ষতি হয়না বরং মিষ্টতর করে তোলে। অবশ্য সেই সঙ্গে একথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে কেবলমাত্র রাগ রাগিনীতে এই স্বরের মিশ্রনই মিষ্টত্বের কষ্টি পাথর নয়।

এই মতের স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন যে রাগ-রাগিণীর নির্দিষ্ট সরগম বা স্কেল-এর অন্তরালে অনেক সময় প্রচ্ছন্ন (latent) স্বরের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রয়োগ শিল্পীর সৃজনী প্রতিভার তারতম্যে কখনও বা এই স্বরগুলি সঙ্গীতকর্মের মধ্যে আত্মবিকাশ করে। শিল্পীর এই সৃজনী প্রতিভা কোনও নিয়মের বশবর্তী নয় তবে স্বরবিশেষের প্রয়োগ বিহ্বলতা (Super charge) যে এই স্বরগুলিকে আমন্ত্রণ জানায় একথা ঠিক। Rule of two fifth নীতিতে এই প্রচ্ছন্ন স্বরগুলিকে খুজে বের করা যায়। এই তত্ত্বটিকে বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করে সম্প্রতি প্রচারিত কল্যান ঠাট থেকে হিন্দোল রাগের জন্মপদ্ধতি তত্ত্বের অসারতার দাবী করেছেন এবং বলেছেন যে কোনও ঠাটের সরগমে স্বরবিশেষের যোগ বা বিয়োগে নূতন রাগ রাগিণীর সৃষ্টি হয় না।

আমাদের মতে অমিয় বাবুর এই তত্ত্বটির বহুল প্রচার হওয়া উচিত। ভারতীয় সঙ্গীতে তথাকথিত "ক্ল্যাসিকাল" গান থেকে অন্যান্য গানের মধ্যে সর্বদাই একটা ভূয়া সীমারেখা টানা হয়ে থাকে। গীত পদ্ধতি, তালের বৈশিষ্ট্য বা গলার কর্তবের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রভেদের যুক্তি অবশ্যই আছে কিন্তু সুরের মহিমায় বা রসসৃষ্টির প্রগাঢ়তার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রভেদের সার্থকতা কোথায়? অমিয়বাবু এই Rule of two fifth তত্ত্বটির মাধ্যমে ভারতীয় সঙ্গীতের

রাগ-রাগিণীর বিপুল সম্ভার থাকা সত্ত্বেও যুগে যুগে নূতন রাগ রাগিনী ও লোকসঙ্গীত গুলির প্রতিষ্ঠার চাবিকাঠিটি খুঁজে বের করেছেন। আধুনিক যুগে অবশ্য নূতনত্বের যুক্তিতে রাগ-রাগিণীর এই বৃহত্তর কাঠামোটি না মেনেও সঙ্গীত পরিবেশন চলেছে। এর পেছনের যুক্তিটি হল এই যে কাব্যরস যেমন একই রচনার মধ্যে পরিবর্তনশীল তেমনি সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সম্ভব। এই নীতির পেছনেও একটা পদ্ধতি রয়েছে কিন্তু এরই অত্যাধুনিক-সংস্করণ হল কোনও রীতি না মেনে, কোনও রস সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সামনে না রেখে কেবল গতিশীলতাকে বজায় রাখা। অমিয় বাবু কিন্তু ঠিকই বলেছেন, যে আমরা এধরণের গীতিকর্মের প্রতি কদিচ কখন আগ্রহ দেখালেও সেইটুকুই দেখাই যেটুকু শিশুদের নিরর্থক অঙ্গ সঞ্চালনের প্রতিও দেখাই। সুতরাং নূতন সৃষ্টির পেছনে প্রকৃত শিল্পপ্রতিভার তাগিদ থাকা চাই। তবেই প্রকৃত সৃষ্টি সম্ভব।

সঙ্গীত বিচারের কচকচির মধ্যেও অমিয় বাবুর একটি গূঢ় মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় বইখানিতে। সেটি হল ভারতীয় সঙ্গীতে এক উদার মতের আন্দোলন ও সেই সঙ্গীতের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। এতে ভাবালুতার আতিশয্যের পরিবর্তে যুক্তির প্রাধান্য বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। অঙ্কের ভাষায় বক্তব্য প্রকাশিত হলেও অনেক হৃদয়গ্রাহী তুলনার মাধ্যমে তার মধ্যে রস সঞ্চারিত হয়েছে। ভাষার প্রাঞ্জলতা আর ইংরাজি প্রতিশব্দ চয়নে দেখা গেল অমিয় বাবু সিদ্ধ হস্ত। এতদিনে বোধকরি অন্যান্য মহাদেশে ভারতীয় সঙ্গীতের নিগূঢ় বার্তাটি পৌঁছে দেবার যথার্থ প্রতিনিধিমূলক মুখপাত্র প্রকাশিত হল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বইখানি প্রকাশের সহায়তা করে গুণগ্রাহীতার পরিচয় দিয়েছেন।

নরেন্দ্রকুমার মিত্র

হিমতীর্থ ।। শ্রীসুকুমার রায়॥ প্রকাশক ঃ অনাদি নাথ নান॥ ৩·৫০

শ্রীসুকুমার রায়ের 'হিমতীর্থ' বইখানি পড়ে আনন্দ পেলুম। এটি লেখকের কেদার-বদরি-ভ্রমণ-কাহিনী। কেদার-বদরির পথের সৌন্দর্য পবিত্রতা ও রোমাঞ্চ লেখক সহজ সরল ভাষায় অথচ যথেষ্ট মুন্সিয়ানার সঙ্গে এই বইতে ফুটিয়ে তুলেছেন। কেদার-বদরির পথের একাধিক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আমাদের সাহিত্যে প্রচলিত আছে, তৎসত্ত্বেও এই বইখানির প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় না। লেখক বয়সে তরুণ, তরুণ মনের সজীবতা স্ফূর্তি ও প্রীতি-প্রসন্নতা বইটির ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে থাকায় তা পাঠকের বিশেষ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। লেখক একজন ভ্রমণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি যে শুধু কেদার-বদরি ভ্রমণ করেছেন তা নয়, পার্বত্য অঞ্চলস্থিত অন্যান্য দুর্গম কৈলাস ও মানস-সরোবর তীর্থের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিমালয়-তীর্থ-ভ্রমণের বিচিত্র ব্যাপক অভিজ্ঞতার রসে সমৃদ্ধ হওয়ায় বইটি পাঠকের মনে পাঠের আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণের সুখও জাগিয়ে তুলবে।

অধুনা বাংলা ভাষায় 'হিমালয়-সাহিত্য' নামে একটি বিশেষ শাখার সাহিত্যই গড়ে উঠেছে বলা যেতে পারে। শ্রীসুকুমার রায়ের 'হিমতীর্থ' তাতে একটি চিত্তাকর্ষক সংযোজন।

নারায়ণ চৌধুরী

দীর্ঘ গ্রীষ্মকাল সানন্দে

যাপন করুন

তাঁতের কাপড় যাঁরা ব্যবহার করেন গরম বা আর্দ্র তাকে তাঁরা ভয় পান না। বাড়ীতে, কাজের জায়গায় অথবা ছুটিতে, কোমল, বাতাসের মতো হাল্কা, উজ্জ্বল ও আরামদায়ক তাঁতের কাপড়, শীতলতার পরশ এনে গরমকে দূরে রাখে।

হাতের তাঁতের বস্ত্রসামগ্রী

আরামদায়ক • সুন্দর • বৈশিষ্ট্যপূর্ণ

রপ্তানীর জন্য হাতে তাঁতের বস্ত্রসামগ্রী শিগ্‌গীরই গুণানুসারে চিহ্নিত করা হবে—বিশদ বিবরণ নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যাবে

অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম বোর্ড

শাহীবাগ হাউস, উইকেট রোড, বোম্বাই-১

DA 59/118